ভাবমুখে

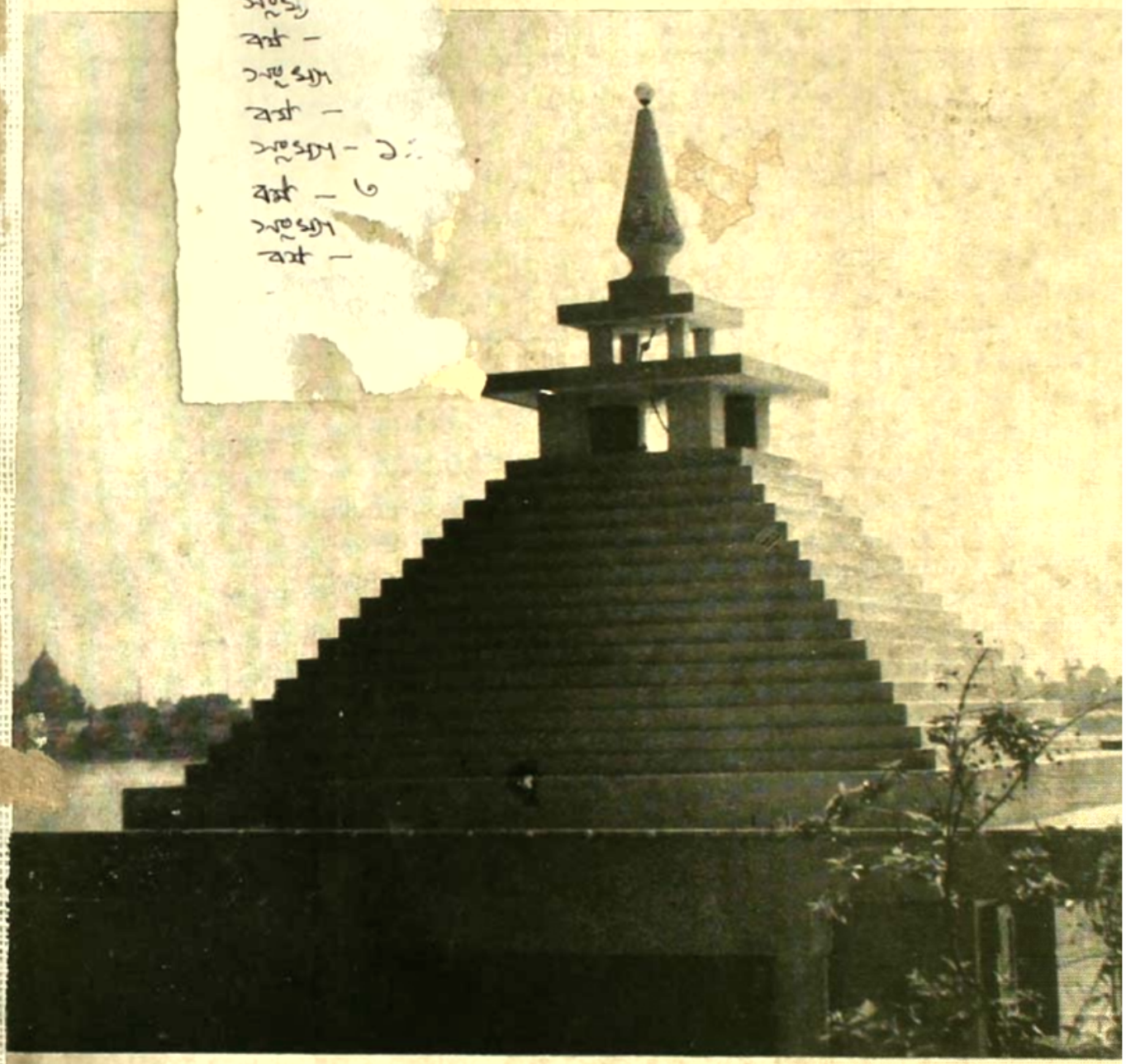

"শ্রীমন্দির"

শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেবের নব নির্ম্মিত মহাসমাধি মন্দির

বৈশাখ • চতুর্বিংশ বর্ষ • তেরশো সাতাত্তর • শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, সি

R. B. S. RUBBER MILLS (P) Ltd.
3, BENTINCK STREET · CALCUTTA-1

You Can
Depend
upon

BUCKETS

MANUFACTURERS :

SHREE KRISHNA PRIVATE LTD.
P.O. BOX 3091 CALCUTTA

বৈশাখ
প্রথম সংখ্যা

চতুর্বিংশ বর্ষ
তেরশ সাতাত্তর

কুহু আর কুহুটি	
শ্রীশ্রীঠাকুরের আশিস্ লিপি	
ধর্মের নূতন খাতা	শ্রীশ্রীঠাকুর
কে দেবে উত্তর ?	শ্রীঅর্চ্চনাপুরী
দুঃখীর ঠাকুর	উমানন্দ
যুগ ও কবি : দেশ ও কবি	ডক্টর অরুণ গোস্বামী
স্বাগতম্ হে নূতন	শান্তশীল দাশ
অচেনা বৈশাখ	অংশুমান রায়
সত্যানন্দ-বাণী	
বরষের প্রথম প্রণাম	কালিবর
পরম গুরু তাঁহারেই বলি	শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়
তোমার চরণ ছায়া—তলে	শ্রীনিবারণ চক্রবর্ত্তী
বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠা	সুশান্ত সরকার
বাণী—বীথিকা	বুদ্ধ ও বিশ্বকবি
গীতার বাণী	সাধনাপুরী
পথিক	শ্রীমাধুরীপুরী
যোগ ও যুগাচার্য্য	স্বামী শিবানন্দ
বেদচ্ছন্দা	সঙ্কলয়িত্রী—সাধনাপুরী
দক্ষিণ তীর্থে	শ্রীবীণাপুরী
শ্রীমার সন্তানের কথা	মৃগেন্দ্র হুগড়
বিশ্বাস বহ্নি	স্বামী বোধানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণ মঙ্গলকাব্য	শ্রীঅর্চ্চনাপুরী
সাধনা-চম্পূ	শ্রীপুরী
ভাবমুখে	শ্রীসুধীর গুপ্ত
ভারতে আধ্যাত্মিকতার সৃষ্টি রহস্য	অরুণা মুখোপাধ্যায়
প্রফেসর হাক্সলের সম্বন্ধে	অধ্যাপক সমীর ভট্টাচার্য্য
গীত সুধারস	প্রবীর মজুমদার
আবার আসবে কি ?	রচনা—স্বামী সত্যানন্দ সুর ও স্বরলিপি—প্রবীর মজুমদার

সর্ব্ববিধ অম্লরোগের
শ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক

ম্যাগসিল ট্যাবলেট

বুকজ্বালা; গলাজ্বালা, পেটফাঁপা প্রভৃতি অম্লরোগের যাবতীয় উপসর্গে আশু শান্তিবিধান করে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা—বোম্বাই—কানপুর
দিল্লী—মাদ্রাজ—পাটনা

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া

হেড অফিস—মহাত্মা গান্ধী রোড—বোম্বাই-১

আগামী দিনগুলোর কথা ভাবুন—

এখন থেকেই সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে সঞ্চয় করুন।

মোট আমানতের পরিমাণ—৫০০ কোটি টাকার উর্দ্ধে।

প্রায় ৭০০ শাখা দেশের সেবায় নিযুক্ত। সুদক্ষ ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যাঙ্কিং কাজ কারবারের জন্য আমাদের যে কোন অফিসে একটা হিসাব খুলুন। ক্ষুদ্রশিল্প ও কৃষির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার সহ ঋণদানের বিশেষ ব্যবস্থা।

আসাম, বিহার, উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গের প্রধান কার্য্যালয়

৩৩, নেতাজী সুভাষ রোড—কলিকাতা-১

ভি. সি. পাটেল—পি. সি. মেহতাওয়ালা—　　বি. সি. সর্বাধিকারী

কাষ্টডিয়ান　　—জেনারেল ম্যানেজার—এসিষ্টাণ্ট জেনারেল ম্যানেজার, কলিকাতা

বিষয়-সূচী

মাণিক বনের বুলবুলি		
বুলবুলির চিঠি		বড় ময়ূর
ভাগ্যবান বৃক্ষ		শ্রীদয়ুনাথ
আশ্রম সংবাদ		
সমালোচনা	৫২	
Ethical Epistemology of the Gita	53	Swami Satyananda Dev
Rabindranath—The Great Educator	54	Susanta Kumar Sarkar M.A.
Spritual Talks	56	From R. L. Goel's Diary

'ভাবমুখের নিয়মাবলী'

'ভাবমুখে' সিউড়ি, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের মুখপত্র।

বর্ষারম্ভ বৈশাখ মাস। বর্ষের যে কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়, কিন্তু কমপক্ষে ৬ মাসের গ্রাহক হইলে সুবিধাজনক হয়। **বার্ষিক মূল্য** সডাক টাঃ ৫·০০ পঃ। ষাণ্মাসিক টাঃ ২·৫০ পঃ।

প্রতিমাসে পত্রিকা সেই মাসের দশ তারিখের মধ্যে প্রকাশিত হয়, অবশ্য বিশেষ কারণ না থাকিলে।

রচনা: ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শিল্প বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশ করা হইয়া থাকে। **প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠান প্রয়োজন।**

ছয়মাস পরে অমনোনীত প্রবন্ধাদি নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

কোন রচনা প্রকাশ করা সম্পূর্ণরূপে সম্পাদকের অভিমত সাপেক্ষ। সমালোচনার প্রয়োজন হইলে দুই কপি করিয়া পুস্তক প্রেরণ করা আবশ্যক।

বিজ্ঞাপন: বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু পূর্বমাসের মধ্যে পাঠাইলে উহা পরবর্তী মাসে প্রকাশ করা হয়। বিজ্ঞাপনের হার পত্রযোগে জানিতে পারিবেন।

বিঃ দ্রঃ—গ্রাহক গ্রাহিকাগণের প্রতি নিবেদন এই যে, পত্রিকা উপযুক্ত সময়ে না পাইলে সর্বপ্রথম স্থানীয় ডাকঘরে সন্ধান লইবেন এবং পরে অফিসে জানাইবেন। পত্রাদি লিখিবার সময় গ্রাহক সংখ্যা উল্লেখ করিবেন।

বার্ষিক চাঁদা বৈশাখ মাসের মধ্যে মণিঅর্ডার যোগে নাম ও ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া —'ভাবমুখে' কার্যালয়ে প্রেরণ করিবেন।

কোন গ্রাহক গ্রাহিকা ঠিকানা পরিবর্তন করিলে উহা পূর্ববর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে কার্যালয়ে জানান আবশ্যক। **পত্রিকা সচিব**—'ভাবমুখে' কার্যালয়; ২, পি. কে. সাহা লেন, কলিকাতা-৩৬। ফোন: ৪৬-২৭৭০

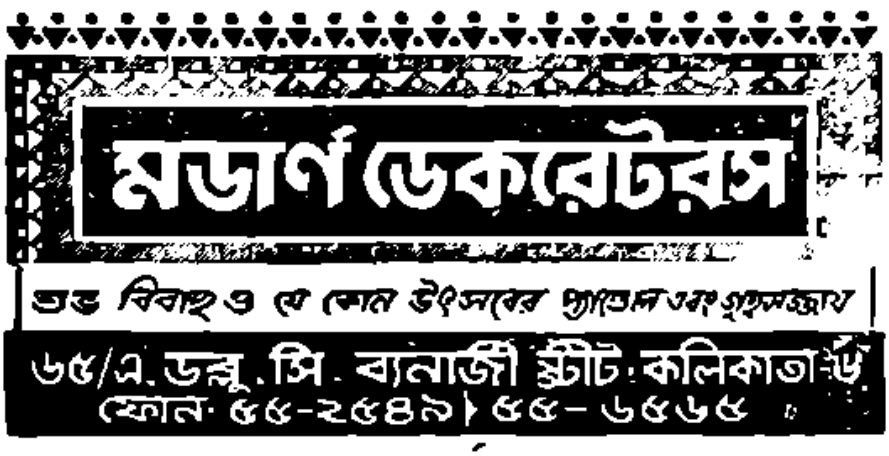

ফোন : ৩৪-৭২৫৬

এন্. কে. স্পোর্টস্

৬৭এ, মহাত্মা গান্ধী রাড, কলিকাতা-৯

যাবতীয় খেলাধুলার সরঞ্জাম এবং কাপ শীল্ড ইত্যাদি বিক্রেতা।
বিভিন্ন ক্রীড়ামোদী কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম পরিচালিত বিদ্যাপীঠ সমূহের যাবতীয় প্রয়োজনীয় খেলাধুলার সরঞ্জাম আমরা সরবরাহ করিয়া থাকি।

শাল, আলোয়ান, সোয়েটার, সকল রকম শীতের পোষাক, বেনারসী, সিল্ক, তাঁতবস্ত্র, মিলবস্ত্র সর্ব্বপ্রকার তৈয়ারী পোষাক, হোসিয়ারী ও আধুনিক ডিজাইনের ডেকরণ, টেরিলিন, টুইল ও ওয়াস্ এণ্ড ওয়্যার শাড়ী বিক্রেতা।

রামকানাই যামিনীরঞ্জন পাল প্রাঃ লিঃ

বড়াবজার, কলিকাতা-৭

ফোন : ৩৩-২৩০৩

ELECTRICAL MOTOR, DOUBLE ENDED, GRINDER, POLISHING & BUFFING, FLEXIBLE SHAFT GRINDER, ETC

Manufactured by :-

K H A M A E L E C T R O - W O R K S

146, SHYAMNAGAR ROAD, DUM-DUM, CALCUTTA-28

Phone : 57-2799

শ্রীরামকৃষ্ণপদ ভরসা

৺বামাপদ ঘোষ প্রতিষ্ঠিত

নারিকেলডাঙ্গা রোলার ফ্লাওয়ার মিলস্

১৭/৪ কেনেল ওয়েষ্ট রোড, কলিকাতা-৯

স্থাপিত ইং ১৮৮৮ সাল

৮২ বৎসরের

জাতীয় প্রতিষ্ঠান

ফোন : ৩৫-৪১২৪
৩৫-৪১২৫

স্বত্বাধিকারী :-

রথীন্দ্রনাথ ঘোষ এণ্ড ব্রাদার্স

PELICAN ENGINEERS

Specialists in

STAINLESS STEEL & P. V. C. HING CHEMICAL,
PHARMACEAUTICAL AND PRESERVATION
MACHINERY

With Compliments From :—

VOLTAS LIMITED

In Service To All

'SAFEX' LAMINATED SAFETY GLASS
TOUGHENED GLASS
"TWINBIRD" MIRRORS ETC

Manufactured by :—

Hindusthan Safety Glass Works Private Ltd.

2, ST. GEORGES GATE ROAD, HASTNGS.
CALCUTTA-22.

Gram : "DEVGLASS" 45-3987

"Man is the highest temple of God and the Worship
of God through man is therefore the highest"

—Vivekananda

Emsons Pharmaceuticals Private Limited

144A, RASH BEHARI AVENUE,
CALCUTTA-29.

Phone : Office : 46-7910

N. G. CHAKRABARTI & CO.

MANUFACTURERS OF ALLOY STEEL CASTNGS

Such as

NICKEL CHROME STEELS
HEAT RESISTING STEELS
STAINLESS STEELS
AUSTENITIC MANGANESE STEELS
MADE IN
INDUCTION FURNACE

FINEST GREY IRON CASTINGS
HEAT RESISTING ALLOY IRON
HIGH DUTY IRON
THIN WALLED CASTINGS
GRADED IRON CASTINGS
OF
ALL SPECIAL GRADES & SIZES

QUALTY—GUARANTEED

Works :
K-65, HOWRAH INDUSTRIAL ESTATE,
P. O. BALITIKURI
HOWRAH, (West Bengal)
Telephone : 66-4843

Office :
3-D, NANDY STREET,
CALCUTTA-29
Telephone : 47-5248
Telegram : ENGEECEE

ভাবমুখে

চতুর্বিংশ বর্ষ | তেরশ সাতাত্তর | বৈশাখ | প্রথম সংখ্যা

কুহু আর কুঝ্‌টি

স্বামী সত্যানন্দ

ভোরের আঙ্গিনায় আজ বড় ডাকাডাকি—
বছরের প্রথম-দিনে নারকেল কুঞ্জে কেন এত পঞ্চমে মস্তির
গঙ্গার ওপরে একটু একটু মেঘ নেমেছে—
তার ওপর দিয়ে আলো সাঁতরে আসছে দিশেহারা হ'য়ে—
Impressionismএর মস্ত বড় একটা ছবি।

মনে পড়ে যায় Carrotএর By no breeze stirred ছবিখানা—
তার মূল কথা ছিল,—first impression আমরা
যেন হারিয়ে না ফেলি।

এই যে গঙ্গার অস্ফুট রোমাঞ্চ,
এই যে কোকিলের ডাকাডাকি—
প্রথম বছরকে মধুর ক'রে তোলা নাকি ?·····?

শ্রীশ্রীঠাকুরের আশিস্ লিপি

কল্যাণীয়া—কল্যাণীয়—

সকলে শান্তিতে থাকবে। মনে রেখো জগতে কোথাও শান্তি নেই। যতক্ষণ না নিজের মধ্যে শান্তি পাবে জগতের কেহ কোন শান্তি দিতে পারে না। শান্ত ও ধীর হয়ে যাও—ঠাকুরের চরণে এই আমার একান্ত প্রার্থনা। সংসারে যেটুকু করা প্রয়োজন সেটুকু করবে আর বাকী সময় শ্রীঠাকুরের নাম ও ধ্যান যতদূর পারবে করে যাও। কেবল জপ ও ধ্যান করে যাও অন্য পথ নাই। ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটলে চলবে না।

শান্ত হও, সমস্ত সহ্য করিয়া চলিবে। নামটি সকল অবস্থায় করিয়া যাইবে। গীতাটী পড়িও। ওর ভিতর ভাল শ্লোকগুলি দাগ দিয়া লইও। সেগুলি বার বার পড়িয়া মনে রাখিতে হইবে। আশিস্ নিও।

ধর্ম্মের নূতন খাতা

শ্রীশ্রীঠাকুর

ধর্ম্মের খাতায় জমা খরচ দেখা চাই। সারা বছরের হিসাব নিকাশ, দক্ষ হিসাব পরিদর্শকের হাতে করিয়ে নিতে হয়। গুরুই এর অডিটার। লাভ ক্ষতির হিসাবে তাঁর স্বাক্ষর হওয়া দরকার আর তারই ওপর নববর্ষে নূতন খাতা যেন আমরা খুলতে পারি—পুণ্য মনে, পুণ্য স্থানে, ইষ্টকে সাক্ষী করে। আমাদের ধর্মজীবনের নূতন খাতায় প্রথম পাতায় অঙ্ক যেন লাভের কোঠায় থাকে। যেন নববর্ষে আমরা ধর্ম্মের কারবারে দেউলিয়া না হয়ে যাই—যেন আমাদের কারবার লাভের হয়—এই প্রার্থনা কায়মনোবাক্যে যেন আমরা করতে পারি ইষ্টের চরণে—যেন মনে রাখি ধর্ম্মের কারবার সব কারবারের উপর। এই কারবার অনন্তকালে বিধৃত। ইহপরকাল বিস্তৃত।

কে দেবে উত্তর ?

শ্রীঅর্চ্চনাপুরী

ফেলে আসা চৈত্রের কোনও প্রান্তে যদি
থাকে কোন আনন্দের মধুবন্তী ছবি
পরে সেটা হয় যদি নির্ম্মম ইঙ্গিতে
আনমনে ফেলে দেওয়া ছিন্ন এক লিপি
কোন্‌টা বাস্তব ?
একটা বৈশাখী সন্ধ্যা দিগন্তের কোলে
এঁকে দেয় সাধ ক'রে চাঁদের আলপনা
আর এক বর্ষণ বেলা অশৈল্পিক মনে
ক্রূর হাতে মুছে দেয় সে শিল্প চেতনা·
কোন্‌টা সার্থক ?
ভাগ্যটা কি খেলা শুধু—নিয়তিরই হাতে
গড়ি তার ভাঙনের চর ধরে ধরে
হাসি খেলা গানগুলো কাঁচের পুতুল
আঁকড়ে ধরতে যাও ভেঙে যাবে প'ড়ে
দাম নেই তার ?
বিদ্রোহের গান নয় হে ভাগ্য বিধাতা
যদি বলি এ আমার দীন প্রশ্ন শুধু
যা কিছু বাস্তব হায় তা কেন নিষ্ঠুর
কেন নাই লেখা কোন অপার্থিব মধু
কেন ? কেন ? কেন ?
সত্য যদি দূরে ঠেলে শিব ও সুন্দরে
জগৎ কি হ'য়ে যাবে অছন্দের কবি
একটা মাটির ফুল বৃথাই কি তবে
দূর থেকে টেনে নেয় স্বর্গের সুরভি ?
কে দেবে উত্তর !—

দুঃখীর ঠাকুর

উমানন্দ

"আকাশে উঠিছে অবিরাম
অযেয় প্রেমের যত ব্রতের পরশ লইল।"

নবনব বসন্তে যেমন একই বৃক্ষ নূতন সাজে সজ্জিত হয়ে নূতন রূপে প্রকাশ পায় সেরূপ শ্রীঠাকুরের জীবন নানা রূপের প্রকাশনায় ভক্ত জীবনে আনন্দ দিয়েছে। শ্রীঠাকুর একাধারে যেমন কঠোর ত্যাগব্রতী অন্যদিকে তাঁর কুসুম কোমল মন দীন দুঃখীর যন্ত্রণায় কাতর। শ্রীঠাকুরের এই কল্যাণ ধর্মীকপটি শুধু যে মানুষের দুঃখেই কাতর তা নয় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পশুদের যন্ত্রণাতেও তাঁর দেব হৃদয় বিচলিত হতে দেখেছি। বাড়ীর কুকুর 'জিম' ছিল ঠাকুরের ভক্ত; এই কুকুরটি একাদশীর উপবাস করত আর সবচেয়ে প্রিয়খাদ্য ছিল শ্রীঠাকুরের দেওয়া চীনাবাদাম। শান্ত মেজাজের এই সারমেয় পুঙ্গবটি ধ্যানমগ্ন ঠাকুরের যেন পাহারাদার ছিল। তপস্যা কালে শ্রীঠাকুর প্রায়ই তাঁর তপস্যা গৃহের চৌকাঠে মাথা দেওয়া নিদ্রিত কুকুরটির শরীর স্পর্শ করতেন। শ্রীঠাকুরের শ্রীমুখে এই কথা শুনেছি "দেখ, ধ্যানের পর ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার সময় কোন কোন দিন জিমের গায়ে পা দিয়ে ফেলেছি এতে জিমের কখনও বিরক্তি দেখিনি বরং কতনা খুসী হয়েছে সেই ভাব দেখাত। সেই জিমই সিউড়ী আশ্রমে থাকাকালীন পাগল হয়ে গেল। শ্রীঠাকুরের সেকি ভাবনা—সুরথ বাবু (ডাক্তার) দেখলেন, বললেন—জিমকে পশুচিকিৎসালয়ে না দিলেই নয়—এতে হয়ত অন্যের ক্ষতি হতে পারে। অনিচ্ছা সত্বেও শ্রীঠাকুর সুরথ বাবুর পরামর্শমত সিউড়ীর পশু হাসপাতালে জিমকে পাঠালেন। সেখানে জিমের দেহান্ত ঘটে; খবর শুনে শ্রীঠাকুরের কত ব্যাকুলতা, যেন নিজের কোন:অঙ্গহানির মূর্ছা হয়েছে। সেদিন কত কথাই না জিম সম্বন্ধে বললেন। শেষে আমাকে বললেন, 'তুই নিজে রিক্সায় করে নিয়ে আয়, এই আশ্রমেই জিমকে সমাধি দেবো।'

আমি আশ্রমের রিক্সাটি চালিয়ে হাসপাতাল থেকে জিমকে আশ্রমে নিয়ে আসার পর শ্রীঠাকুর স্বয়ং উপস্থিত থেকে জিমকে মধুর "হরিনামকরণ" ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে জিমের সমাধি দেওয়ালেন। সুহাস (স্বামী সুরেশ্বরানন্দ) তার সমাধিতে ফুল বিছিয়ে দিলে—শ্রীঠাকুর বললেন 'জিমের নামে তোমরা খানিকটা জপ কর, জিম একজন ভক্ত ছিল।—'

সামান্য পশু জিম, এর জন্যও শ্রীঠাকুরের চিত্ত কত ব্যথিত হয়েছিল—ভক্ত, সে পশুই হোক আর মানুষই হোক, 'ভগবানের প্রাণ'। এরপর ঠাকুরের জীবদরদী প্রাণের আর এক প্রকাশ দেখতে পাই। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসবে জয়দেবের মহান্ত মহারাজের এক বিরাটকায় হাতি এসেছিল উৎসবের শোভা বর্ধন করতে। সেদিনকার উৎসবের শোভাযাত্রাতে তিনটি হাতি ছিল। উৎসবের শেষে মহান্ত মহারাজের হাতিটিকে সহরের বাইরে এক পুকুর ধারে রাখা হয়েছিল। রাত্রি তখন ৯।১০টা হবে; হঠাৎ শ্রীঠাকুর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বল্লেন, 'চল্ হালু একবার হাতিটাকে দেখে আসি।' আশ্রমে উপস্থিত ভক্তগণ একবাক্যে বাধা দিলেন কিন্তু শ্রীঠাকুর

অনড় ; শেষে নিজেই বাইরের দিকে এগিয়ে চললেন। নিরুপায় ভক্তবৃন্দ শ্রীঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে সেই দরজার প্রান্তে উপস্থিত হলেন। ব্যাপার কি ? শ্রীঠাকুর এই রাত্রে হঠাৎ এমনভাবে ত্রস্তে হাতিটার কাছে এলেন কেন ? ব্যাপারটা পরিষ্কার হ'ল হাতির মাহুতের কথা শুনে। মাহুত যা বলল তার সারাংশ হচ্ছে এই—'বাবু কেন জানিনা হাতিটা উৎসব থেকে আশ্রমে বাবা ঠাকুরের আদর খেয়ে যেন নাচতে নাচতে এল ; বাবা ঠাকুর ওকে নিজের হাতে চাল খাইয়েছিল তাতে যেন ব্যাটার আনন্দ আর ধরে না—মহান্ত মহারাজের হাতি কিনা ? তাই সাধু ফকিরের হাতে খেতেই ভালবাসে। আমিও ওকে এখানে চালিয়ে নিয়ে এলাম খানিকটা দলাই মলাই করলাম, কিন্তু ব্যাটার মেজাজটা ভাল দেখলাম না। যেন ব্যাজার ব্যাজার। ব্যাটাকে খেতে দিলাম। ব্যাটা ছুঁলেও না—আমি বললাম—'থাক না খেয়ে' এরপর হলকি—না অনবরত চীৎকার—আমিত বাবু ভয় পেয়ে গেলাম—পাগল হয়ে গেল নাকি ?"

আমরা সব কথা শুনলাম। দেখি হাতিটা শুয়ে আছে। সকলকে অবাক করে শ্রীঠাকুর আস্তে আস্তে তাঁর পদ্মকোরকের মত চরণ দুটি দিয়ে হাতিটার ওপর দাঁড়ালেন। আমরা সকলে একটু ভয় পেয়ে গেলাম, যদি হাতিটা উঠবার চেষ্টা করে তা হলে শ্রীঠাকুর পড়ে গিয়ে আঘাত পেতে পারেন। কিন্তু হাতিটা যেন তার পরম ধনকে পেয়ে আহ্লাদে আটখানা, আর আর স্বরে কত কথা—শ্রীঠাকুরও বললেন, 'থাক থাক হয়েছে এবার চুপ করে শুয়ে থাক।' আশ্চর্যের কথা হাতিটা সত্যই চুপ করে গেল। পরের দিন মাহুতের মুখে শুনলাম সারারাত্রি হাতিটা অতি শান্ত ভাবেই ছিল। হে দুঃখিয়া-কে ঠাকুর, দুনিয়া কে পারে, তোমার মত দরদী বন্ধু হারিয়ে আজ আর্ত মানুষ, অসহায় মানুষ তাদের ঘোরা কান্নায় আকাশ বাতাস ভরিয়ে তুলেছে। তাদের তুমি ছাড়া যে কেউ নাই, কেউ ত তাদের যন্ত্রণা বুঝবে না!

আজ 'যদেন্দ্র ডোম' সিউড়ীর রাস্তায় রাস্তায় কাক ডাকা ভোর হতে না হতে বেরিয়ে পড়ত (চোখে ভাল করে দেখতে না পেলেও) তোমার নাম গুণ গান করতে ; নিষ্ঠুর মানুষ ! তাকে কত না পীড়ন করত- এমন কি তার শরীরে পরম জল ঢেলে দিতেও কসুর করেনি। সেদিন ত' দেখেছি ঠাকুর, তোমার ঐ শান্ত সুন্দর দেহে ঐ শুভ্র মৌন অচঞ্চল মনে—পাষণ্ড পীড়নের জন্য ভৈরবের প্রকাশ যার গর্জনে অতিবড় শয়তানও নিঃশব্দে আত্মগোপন করে। হে করুণাময় ! মৃত্যু পথযাত্রী ঐ যদেন্দ্র ডোমের ক্ষুদ্র কুটিরে নিঃশব্দে গিয়ে তাকে নামোল্লাসে মুখরিত করিয়ে তার মৃত্যু ভয় কাটিয়ে—পরপারের কড়ি তার গাঁটে বেঁধে দিয়েছ ! হে ঠাকুর, কুণ্ঠাক্রান্ত কুমারীশ তার প্রাণের আকুতি দিয়ে তোমার নাম গুণ গানে মুখরিত করত সেই ক্ষুদ্র "দরিদ্রনারায়ণ সেবাপর্বের" সময়টুকু। আশ্চর্য্য ! ভক্তের গোপন আকুল প্রার্থনায় কাতর হয়ে তুমি নিঃশব্দে এসে তার রোগ যন্ত্রণা লাঘব করেছ। আমাদের অতিব্রান্তি ও কর্মবৈগুণ্যে তোমায় হারিয়ে জানিনা অনতিদূরবর্তী কালে ঐ কল্যাণকর ও পুণ্যময় বস্তু আগ্নেয়গিরির মৃত্যু-উদ্গারী তপ্তের তলায় নিঃশব্দে বিলুপ্ত হয়ে যাবে কিনা ? কিন্তু হে পরমপুরুষ, পৃথিবীর যত প্রতিঘাতে যে ধ্বংসের সৃষ্টি হয় সেই ধ্বংস শক্তি কল্যাণ ও পুণ্য শক্তির কাছে পরাজিত। কারণ ঐ কল্যাণ ও পুণ্যশক্তি জগতের ধ্বংসকালে তোমারই আশ্রয়ে থাকে। আজ আর্তমানবের অসহায় ক্রন্দন পুত্রহারা জননীর আকুল হাহাকার তোমায় কি বিচলিত করবে না ঠাকুর ?

———

যুগ ও কবি ঃ দেশ ও কবি

ডক্টর অনন্ত গোস্বামী

(১)

সাহিত্যের প্রধান উপকরণ প্রাতিবেশিক বিষয়বস্তু এবং সাহিত্যিক মনের প্রবণতা। সাহিত্য এবং যুগের সম্পর্কও তাই এই দুটি উপকরণের সম্পর্ক বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়েই পাওয়া যাবে। প্রাতিবেশিক বিষয়বস্তু উপাদানের অবাস্তব সন্নিধানই কল্পনা। এই কল্পনা ব্যক্তির কামনা-সংস্কার থেকে জন্মলাভ করে। কামনা সংস্কার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রত্যেক প্রাতিবেশিক পরিধিতে এর গঠন বৈশিষ্ট্য কিছু নতুনত্ব বহন করে, তবে কামনা-সংস্কারের মধ্যে কতকগুলো সাধারণ উপাদানের মূলে থাকে মানবীয় প্রবণতার সাধারণ বৈশিষ্ট্য, যা প্রাতিবেশিক বিষয়বস্তু উপাদানের বিভিন্নতারও কতকগুলো সাধারণ নীতি-অনুযায়ী সম্পর্ক রক্ষা করে। এই উপাদানগত ঐক্যেই সাহিত্যিক সৃষ্ট কাল্পনিক জগৎ সার্বজনীন আবেদন সৃষ্টি করে। তাই স্থান, কাল ও পাত্রের সীমা অতিক্রম করেও কবির সঙ্গে অনুভূতি সঞ্চার করা সম্ভবপর হয়।

অবশ্য স্থান, কাল ও পাত্রগত পরিধিতে কামনা-সংস্কারের বিশেষ বিশেষ রূপ আছে। তাই স্থান-গত আবেদন, যুগগত আবেদন এবং পাত্রগত আবেদনের বিশেষ বিশেষ দিক আছে। কামনা-সংস্কারের যুগগত রূপের সর্বত্র যেখানে স্বীকৃত, সেখানে কবির সৃষ্ট আবেদন যুগকে অতিবর্তন করতে অসমর্থ হয়। অথচ স্থান, কাল, এবং পাত্রগত কামনা-সংস্কার-উপাদান সাধারণ কামনা-সংস্কার-উপাদানের মধ্যে কিছু পরিমাণে অবস্থান করে। তাই যুগাতিশায়ী, স্থানাতিশায়ী এবং পাত্রাতিশায়ী বিষয়ের মধ্যেও স্থান, কাল ও পাত্রের আবেদন আছে।

নিজের অনুভূতি, চিন্তা এবং কর্মে সমর্থন লাভের ইচ্ছা মানুষের সহজাত ধর্ম। এই সমর্থন লাভের স্পৃহাই সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা। সমাজের ওপরে ব্যক্তিকৃত এই প্রয়াসের মধ্যেও স্থান, কাল এবং পাত্রগত উপাদানের চাপ অনেকক্ষেত্রে দেখা যায়। পাত্রগত উপাদানের চাপ সমর্থনকে ব্যক্তি বিশেষের মধ্যেই সীমিত করে। কিন্তু স্থান ও কালগত উপাদনের চাপ সন্নিহিত সঙ্কীর্ণ প্রতিবেশের সমর্থন লাভ স্পৃহার অথবা সাময়িক সমর্থন লাভ স্পৃহার নামান্তর। কিন্তু এই প্রয়াসগুলোর এক একটি দিক সাহিত্যিক আবেদনের ক্ষেত্রে এক একটি অতিরেকপন্থী মতবাদ সৃষ্টি করতে পারে মাত্র। উপাদানগুলির বন্টনে মাত্রা নিয়ে চিরকাল ধরেই বিভিন্ন মত চলে আসবে কিন্তু সাহিত্যিক কৃত এই চাপগুলি মনোগত ভাব বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ। এটা তার স্পৃহামাত্র, দাবী নয়।

ব্যক্তি মনের সঙ্গে যুগের একটা সম্পর্ক আছে। তবে যুগের প্রসঙ্গে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে অনেকটা কুসংস্কার মুক্ত করা প্রয়োজন। প্রাকৃতিক পরিধিতে আবদ্ধ বিভিন্ন জাতীয় সমাজের মধ্যে ভাব-বিনিময় দ্রুত সম্পাদিত হয় বলে, এই সমস্ত পরিধিবদ্ধ সমাজজনের এক একটি সাধারণ রূপ আছে। এই সমস্ত পরিধির মধ্যে এক একটি ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও ব্যক্তিত্বের সামাজিক আপোষের মাত্রা-বিভিন্নতা এক একটি পরিধিবদ্ধ সমাজের

সংস্কারের রূপকে বিস্তৃত করে তোলে। কালস্রোতের সঙ্গে সঙ্গে জাতি-সংঘের এই সমস্ত সংস্কারকে বিবর্তিত করতে সক্ষম হয়। আবার কালস্রোতের মধ্যেই বিশেষ বিশেষ পরিধিভুক্ত সমাজে নতুন নতুন ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ঘটে এবং তদনুযায়ী ব্যক্তিত্বের সামাজিক আপেক্ষের বিভিন্ন রকম মাত্রা-বিভিন্নতা ঘটে। এইভাবে প্রত্যেক যুগে সংস্কারের এক একটি পৃথকরূপ অনুলাভ করে। ব্যক্তিমনের সঙ্গে যুগের সম্পর্ক বলতে যুগ-পরিধির অন্তর্ভুক্ত বিশেষ সংস্কারকেই বোঝায়।

বলা বাহুল্য, কালস্রোতে বস্তু উপাদানের বৈচিত্র্য আসে। কারণ বস্তু উপাদানের বহিঃপরিবেশে পূর্বোক্ত যুগপরিধি-চিহ্নিত চিন্তাভাবনা ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রভাব থাকে। সুতরাং প্রাতিবেশিক বস্তু উপাদানও যুগের দ্বারা চিহ্নিত হওয়া সম্ভবপর।

সাহিত্যের প্রধান উপকরণ বিশ্লেষণে অর্থাৎ প্রাতিবেশিক বস্তু এবং সৃষ্টিধর্মী মা
চিহ্নিতে প্রমাণ করা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেই অসম্ভব নয়।

(২)

সাহিত্যক্ষেত্রে 'দেশ' শব্দটির সংজ্ঞা সাধারণ সংজ্ঞা থেকে স্বতন্ত্র। সাধারণ অর্থে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণে পরিধিযুক্ত অঞ্চলকেই 'দেশ' বলা হয়। অবশ্য এই সংজ্ঞাটি সম্পূর্ণ মূল্যহীন বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না, কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে 'দেশ' বলতে বুঝি একটি বিশিষ্ট সমাজকে অঞ্চলগতভাবে যে পরিধির অন্তর্ভুক্ত করা যায়, সেই পরিধিযুক্ত অঞ্চল। পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের দ্রুততা এক একটি সাধারণ সমাজমন গঠন করে। এই ভাববিনিময়ের দ্রুততার জন্যে একদিকে যেমন দরকার ভৌগোলিক প্রাকৃতিক অনুকূলতা, অন্যদিকে তেমনি রাজনৈতিক আনুকূল্যও প্রয়োজন। বিশেষ রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণে অর্থনৈতিক চিন্তাধারা বিশেষ বিশেষ রূপ লাভ করে। সেক্ষেত্রে বিশেষ সমাজমনগঠনে রাজনৈতিক প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। আধুনিককালেও সাহিত্যে বিশেষ ধরণের একটি সংস্কারের প্রভাবে অনেকে সাহিত্যক্ষেত্রে 'দেশ' শব্দটির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিভ্রান্তিমূলক আলোচনা করে থাকেন। অবশ্য এর মূল্য তখনই থাকে যখন সাহিত্য নিজে রাজনীতির দ্বারা আক্রান্ত হয়। আধুনিক যুগে এ ধরণের সাহিত্য সম্পর্কিত মতবাদই 'দেশ' সম্পর্কে ধারণা-বিশেষের জন্যে দায়ী।

আবার ভৌগোলিক প্রাকৃতিক বিভাগকেও অনেকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। প্রাকৃতিক বিভাগের অবশ্য অত্যন্ত বেশি প্রভাব সমাজ মনে থাকে। ভাববিনিময়ের দ্রুততার জন্যে প্রয়োজন যাতায়াতের সরলতা। ভাবের বাহন মূলতঃ বাক্ এবং লিপি। উভয়ক্ষেত্রেই যাতায়াতের সরলতার অভাব যথেষ্ট অন্তরায় সৃষ্টি করে। তাই প্রাকৃতিক আনুকূল্যে সমাজ মনের বিশিষ্টতা অত্যন্ত সহজেই প্রকাশ পায়।

কিন্তু রাজনৈতিক এবং প্রাকৃতিক পরিধিকে শেষ কথা ধরে নিলে আন্তর্জাতিক সাহিত্য-চিন্তা এবং বিভিন্ন অঞ্চলের সাহিত্যে পারস্পরিক প্রভাবের প্রশ্ন আসে না। বিভিন্ন সমাজে জাতি-সংঘের ঘটবার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যিক 'দেশের' পরিধির বিস্তার ঘটে। এ সব ক্ষেত্রে সাহিত্যিক 'দেশ' সম্পর্কে আলোচনাকে আধুনিককালে অনেকে অবান্তর বোধ করছেন। এর অবশ্য কারণ আছে।

আধুনিক আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভাব-বিনিময়ের দ্রুততা অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি পেয়েছে বলে আজকাল অনেকেই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রকেই সাহিত্যিক 'দেশ' বলে মন্তব্য করে থাকেন। এই পরিধির মধ্যে এক একটি ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হয়। তদনুযায়ী এক একটি মতবাদও যথারীতি প্রতিষ্ঠা পায়। সাধারণ দেশ নির্বিশেষে এই মতবাদের প্রচারে বিভিন্ন অঞ্চলে এক একটি মতবাদী গোষ্ঠী সৃষ্টি হয়। এই গোষ্ঠী পৃথক পৃথক সমাজের সৃষ্টি করে আধুনিককালে সাহিত্যিক 'দেশ' সম্পর্কে সংজ্ঞাকে মূল্য দিতে চান না। এঁদের মতে, মানবিক প্রবণতার মূল

গতিবিধি যখন অকল-নির্বিশেষে এই পর্যায়ে পড়ে, তখন সন্নিহিত পরিবেশকে মূল্য দেওয়া নিরর্থক।

এই সব অতিরেকপন্থী মতবাদসমূহের মধ্যে থেকেও সন্নিহিত পরিবেশকে স্বীকার করতে আমরা বাধ্য। সন্নিহিত ক্ষেত্রে চিন্তাভাবনা বিনিময়ের দ্রুততা যে মাত্রায় সাধিত হয়, সন্নিহিত ব্যক্তিবর্গের সংস্কার চিন্তাভাবনাকে যতোটা প্রভাবিত করে, তার একটা পৃথক মূল্যকে স্বীকার না করলে সাহিত্যক্ষেত্রে আলোচনা হয়ে পড়ে অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি যুক্ত। তাই দেশ ও কবির আলোচনায় কবির সন্নিহিত অকল বিশেষে যেখানে ভাববিনিময়ের দ্রুততা নির্দিষ্ট মাত্রায় অবস্থান করে, তার স্বীকৃতি আছে।

সন্নিহিতক্ষেত্রে প্রাতিবেশিক বস্তু উপাদানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটে। সাহিত্যে বস্তু উপাদানের যথেষ্ট প্রভাব আছে—যতোটা আছে মানসিক উপাদানের। প্রাতিবেশিক বস্তু-উপাদানের সঙ্গে যখন উপাদান সন্নিহিত সংস্কারগ্রস্ত চিত্তের সংযোগ ঘটে, তখন সেই চিত্তের প্রকাশে অতি সহজেই বিশিষ্টতা ধরা পড়ে।

❀

স্বাগতম্ হে নূতন

শ্রীশান্তশীল দাশ

নব জীবনের আশ্বাস আনো ক্লান্ত ধরণী বুকে
হে নববর্ষ, জানাই সম্ভাষণ;
এখানে জীবন বড়বিষণ্ণ, ব্যথা বেদনায় ভরা।
অশ্রুসিক্ত মানুষের দু'নয়ন।

আশার আলোক পায়না কোথাও, শুধু মাথাকুটে মরে,
আঁধারে আঁধারে চারিদিক মসীকালো;
হে নববর্ষ, সে-আঁধার মুছে—দীপ্ত প্রদীপ ধরো,
আলো দিকে-দিকে আঁধার বিনাশী আলো।

অনেক আশাতো করেনা'ক কেউ, অতি সামান্য আশা,
তাও পূরে নাকো, বারে বারে ভেঙে যায়;
যেদিকে তাকাই শুধু বিফলতা, পাইনা'ক আশ্বাস,
এখানে মানুষ ম্রিয়মান হতাশায়।

জীবনের দিনগুলো টেনে টেনে কোনমতে শেষ করা,
শুধু বেঁচে থাকা, এ বাঁচা অর্থহীন;
একটি একটি করে শেষ করা, মুমূর্ষু অন্ধকার,
কত না সাধের জীবনের সোনা দিন।

হে নববর্ষ, আনো তুমি আনো কিছু আলো কিছু গান,
হতমান যত জীবনে জাগাও গতি;
চলুক মানুষ সম্মুখ পথে প্রীতি প্রসন্ন মন,
জানাক বিশ্বধাতার চরণে নতি।

❀

অচেনা বৈশাখ

অংশুমান রায়

বৈশাখ নিষ্প্রভ। নববর্ষের উদ্দীপনা তিরোহিত। বৈশাখের চেনা সেই রূপ, আজ অস্পষ্ট। গাছে গাছে কিশলয়, উদ্দাম কাল বৈশাখী, ক্লান্ত ঘুঘুর ডাক, চাতকের পিউ কিছুই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পাতাঝরা বৃক্ষকে মৃত বলে বোধ হচ্ছে। পত্রপুষ্পে আবার যে সেই বৃক্ষ সজ্জিত হবে এমন সম্ভাবনাকে অবাস্তব বলে মনে হচ্ছে। হতাশা জর্জরিত বৈশাখ। একে বন্দনা করি কেমন করে?

বৈশাখ আসছে বুঝতে পেরেছিলাম। মাথার উপর বিজলি পাখা। রেগুলেটারের কাঁটা শেষ পয়েন্টে। প্রচণ্ড বেগে পাখাটা ঘুরছে। কিন্তু কই ঠাণ্ডা লাগছে নাতো! এতদিন পাখাটা নিঃশব্দে ঘুরতো। এবার কিন্তু একটা সুর শুনতে পেয়েছি। নিরলস একটানা এক ছেলে যাঁতা সে সুর পাখাটা যতক্ষণ ঘুরেছে ততক্ষণ শুনিয়েছে। ওটা কান্নার সুর। বড় গরম পড়েছে। রাস্তায় গরম বাতাসের হলকা। রাস্তার কালো পীচগুলোকে গলতে দেখেছি। বৈশাখের পদচিহ্ন রাস্তার পাশের নিষ্পত্র গাছগুলোতে।

জগৎ পরিবর্তনশীল। মন পাল্টেছে। পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া পাল্টেছে। প্রকৃতি পাল্টেছে। বৈশাখও পাল্টেছে। তাই আজ তাকে চিনতে অসুবিধা হচ্ছে! জীব জগতের বাল্য, কৈশোর, যৌবন, বার্দ্ধক্য আছে। প্রকৃতির কি নেই? নিশ্চয়ই আছে। প্রকৃতিও বৃদ্ধ হয়। বৈশাখ আজ যৌবনের বার্দ্ধক্যে উপনীত। বুড়ো বৈশাখ করুণার উদ্রেক করছে। লোলচর্মসার বয়সের ভারে কুঁকে পড়া যষ্টি নির্ভর এক বৃদ্ধ। চোখের আলো নিবে এসেছে। ঝাপসা পথ। হোঁচট খেতে খেতে চলেছে ঠিক এই বৈশাখের মত। একে দেখে রোমাঞ্চ জাগতে পারে না।

কি যেন নেই তাই এবার বৈশাখকে ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। ছোটবেলায় আমার কাছে একটা টিয়া পাখি নিজেই উড়ে এসেছিল। আমগাছের উঁচু ডালে বসে পালিকের ডাক নকল করত। রাত্রির আশ্রয়ের জন্য শালিকের সঙ্গে ঝগড়া করত। শালিকদের থাকবার জন্য টব কাঠের খোপ করে দিয়েছিলাম। টিয়া পাখিটা তারই একটা খোপ বেছে নিয়েছিল। গায়ে এসে বসত। কোন ভয় ছিল না। হাতে বসে খাবার খেত। অনেকদিন ছিল। হঠাৎ একদিন ওকে আর দেখতে পেলাম না। আম গাছের সবকটা ডাল তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম। বাড়ির পাশে নিমগাছ, ঝাঁকড়া টোপা কুলের গাছ, সব দেখলাম। টিয়াটার দেখা পেলাম না। ও আর ফিরে আসেনি। কদিন সে যে কি মন খারাপ কি বলব। চারিদিক কেবল ফাঁকা ফাঁকা লেগেছিল ঠিক এই বৈশাখের মত।

পায়ের তলায় তপ্ত বালুকা। মাথায় কাঁকা রৌদ্র। শ্রীনারের ডবল ব্যারেল কাঁধে। তিন ইঞ্চির চার নম্বর কার্টিজ লোড করা। নিশানা পেলেই ছোড়ো। ট্রিগারে তর্জনীর মৃদু চাপের অপেক্ষা। লক্ষ্য স্থলে গুলি বিদ্ধ হবেই। সঙ্গে বন্ধু। ওর কাঁধেও বন্দুক। বন্ধুর শিকারের ঝোঁক প্রচুর। আমার টেনে নিয়ে যেত। মরা নদী কংশাবতী। হাঁসের দল ফিরে গেছে। দু একটা কেবল মায়া কাটাতে পারেনি বলে

এখনও থেকে গেছে। বৈশাখের দাবদাহকে সহ্য করে নদীর পাড়ে কোথাও কোথাও কেন যে বসে থাকে কে জানে। বন্ধুর লক্ষ্য ওদের দিকে। সেবার সারাটা সকাল গেল, সারাটা দুপুর এ চরে অনেক ঘোরা হোলো। বিকেল গড়িয়ে প্রায় সন্ধ্যা হবো হবো, এমন সময় দেখতে পেলাম এক জোড়া চখা দূরে নদীর পাড়ে বসে আছে। বন্ধু আর আমি দুজনেই বালিতে শুয়ে পড়লাম। কুনুইতে ভর দিয়ে বুকে হেঁটে গুড়ি মেরে খুব ধীরে ধীরে এগোতে লাগলাম। কিছুদূর যাবার পর বন্ধু আমায় নিরস্ত করে নিজেই এগিয়ে চলল। ওর হাতের টিপ অনেক ভালো। চখা দুটোকে ওর চাই-ই। আমি একটা ছোট বালির ঢিবির আড়ালে থমকে রইলাম। বন্ধু এগোচ্ছে দেখতে পাচ্ছিলাম। চখা দুটো চুপ করে নদীর পাড়ে জলের দিকে তাকিয়ে বসে আছে তাও দেখছিলাম। ভোরে এল, আর বেশিক্ষণ নয়। একটু পরেই বন্ধুর হাতে ওদের ভবলীলা সাঙ্গ হবে। সেই শেষ মুহূর্তটার জন্য রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। বন্ধু আরও এগিয়ে গেছে। পাখি আর তার আততায়ীর মধ্যে দূরত্বটা ক্রমশ কমে এসেছে। বন্ধুকে বন্দুক তুলতে দেখলাম। নিশানা স্থির করে নিচ্ছে। বিকট আওয়াজ! বন্ধু গুলি করেছে। চখা দুটোর একটাকেও উড়তে দেখলাম না। তা হোলে এক গুলিতে দুটোই গেছে? বন্দুক মাথায় তুলে বন্ধু তার শিকারের দিকে দৌড়ালো। আমিও ছুটলাম। দুজনেই প্রায় এক সঙ্গে কাছে গিয়ে বড় অবাক হোলাম। কোথায় চখা?—একটা চুন মাখানো মাটির হাড়ি নদীর স্রোতে ভেসে এসে পাড়ে আটকে রয়েছে। তার গায়ে তিনটে ফুটো। বন্ধুর গুলির সাক্ষ্য বহন করছে। দুজনেই চিৎকার করে উঠলাম, মরীচিকা! এ অন্য এক বৈশাখের কাহিনী।

চৈত্র সংক্রান্তি। একটা বছর কেটে গেল। হিসেব নিকেশ করতে বসে এবার বারে বারে হিসাবে গরমিল হোয়ে যাচ্ছে। কি পেয়েছি আর কি হারিয়েছি—না অসম্ভব, হিসেব মেলানো যাবে না। পাওয়াটা ঠিক আছে। ওটায় হিসেবে কোন গোলমাল নেই। কিন্তু ওই যে হারানোর ব্যাপারটা, ওখানেই যত ঝামেলা। অনেক ঝাঁকিঝুকি কেটেছি, অনেক মাথা ঘামিয়েছি, চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখিনি। শেষ পর্যন্ত কিন্তু কিছুতেই এবারের সালতামামিতে হারানোর পরিমাণ ঠিক করতে পারিনি।

সৈকত জুড়ে উত্তাল সমুদ্র-গর্জন। একদিকে খাড়া উঁচু পাড়। অন্যদিকে দিগন্তকে দেখছি। তরঙ্গোচ্ছ্বাসের ওপারে নীল জল আর নীল আকাশ একাকার। শেষ দেখব বলে সমুদ্রের ধার দিয়ে ছুটে চলেছি। জামা খিসকে, ভিজে পায়ের বন্ধুর পথ। থামিনি, দিনের পর দিন রাত্রির পর রাত্রি বিরামহীন অক্লান্ত ছুটে চলা। কখনও পাড় দিয়ে ছুটছি। পাড় ভেঙে পড়ছে। পড়তে পড়তে বেঁচে যাচ্ছি। আবার ছুটছি। ঘুম ভেঙে গেল। সকাল হোয়ে গেছে। আজ বৈশাখের প্রথম দিন। পঞ্জিকা বলছে এই নাকি বৈশাখ। নিরুত্তাপ বিষণ্ণ এ বৈশাখকে আমি স্বীকার করি না।

সত্যানন্দ-বাণী

অচেতনের চেতন

প্রকাশ-চৈতন্যকে অভিভূত করেছে
এক অপ্রকাশ—চৈতন্য···
একে কেউ বলছেন অবচেতন···
কেউ বলছেন সংস্কার···
কেউ বলছেন সহজাত প্রবৃত্তি···
এই অপ্রকাশ—চৈতন্যকে
প্রকাশ চৈতন্যে পরিণত করতে হবে
সাধন সহায়ে···
তখনই আমাদের সত্তা
এক অখণ্ড চৈতন্যরূপে প্রকাশিত হবে··· ।

আলোচনা :—

আমাদের প্রত্যেক কর্মের পেছনে রয়েছে কয়েকটী শক্তি। এই শক্তি আমাদের কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করছে—আমাদের চালিত করছে—আমাদের সকল কর্মের উৎস—spring of action, এই শক্তিকে নানা মুনি নানা নামে অভিহিত করেছেন। কেউ একে বলেছেন অবচেতন—আমাদের মনের ওপরের স্তর অর্থাৎ চেতন রাজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করছে এই অবচেতন মন। কোন মনোবিদ তাকেই বলছেন—এটা drive—আমাদের অন্তরের শক্তি—তারি ঠেলায় বা খেলায় আমাদের কর্ম নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। আবার ম্যাগডুগ্যাল এই শক্তিকেই বললেন সহজাত প্রবৃত্তি। আমাদের শাস্ত্র মতে এটী হল সংস্কার—মনের নিচে বাসা বেঁধে আছে যুগ যুগান্তরের পুঞ্জীভূত সংস্কার– এই সংস্কারই আমাদের চালিত করে—শুধু এই জীবনে নয়, পরবর্তী জীবনেও পড়ে তার অমোঘ প্রভাব। পাশ্চাত্য মনোবিদ ফ্রয়েড বলেছেন, মনের এই নিম্নস্তরে, অবচেতন মনে, যা আছে সবই base—অশিব বস্তু। পাশ্চাত্য মতে এই অবচেতনকে ক্ষয় করতে হবে। আমাদের ঠাকুর বললেন, মনুষ্যত্ব বা দেবত্ব লাভ করতে হলে সংস্কারকে ক্ষয় করতে হবে। প্রার্থনা, জপ, ধ্যান, নাম, ব্রহ্মচর্য ও মনঃ শক্তি সহায়ে কাটাতে হবে জন্ম-জন্মান্তরের এই সংস্কার।

আমাদের ঠাকুর বলছেন, একটা কাঁটা পায়ে ফুটলে যেমন আর একটী কাঁটা দিয়ে সেই কাঁটাটী তুলে ফেলে শেষে দুটো কাঁটাই ফেলে দিতে হয়, তেমনি অবচেতনকে অবচেতনের দ্বারাই ক্ষয় করতে হবে।

অবচেতনের প্রকাশ স্বপ্নে, তন্দ্রায়। নিদ্রায় semi অজ্ঞান অবস্থায় অবচেতন আমাদের পেয়ে বসে। তখনই তন্দ্রামুখে চলে অবচেতনের খেলা। এই অবচেতনের প্রকাশকে রুদ্ধ করতে হবে। আমাদের ঠাকুর বলতেন, "দেখো, এখানে একটী সাধু আসত। খাওয়া-দাওয়ার পর দেখতাম খুরপি নিয়ে মনের ঘাস কাটছে।

খাওয়া দাওয়ার পর বিশ্রাম করছ না কেন জিজ্ঞাসা করলে ব'লতো—"চেতন নয় সদা সুখী।" অবচেতন আমাদের পেয়ে বসে নিদ্রায়—সুতরাং এই নিদ্রাকে জয় করলে সেও পরাস্ত হবে।

অবচেতনে সব রকম আছে; অবশ্য ফ্রয়েডিয়ান থিওরী হিসেবে নয়—তাঁর মত ব'লো অবচেতনে সবই পশু প্রবৃত্তি। সব না হলেও অবচেতনের অনেকটা জুড়েই ইড বা পশুত্বের বৃত্তি। এই পশু প্রবৃত্তির জাগরণ বা আক্রমণ হয় সাধারণতঃ তন্দ্রায়, স্বপ্নে। তখন একে কি করে রোখা যাবে? এর জন্যে প্রবল ইচ্ছা শক্তির সাহায্য নিতে হবে। ইচ্ছা শক্তি দিয়ে অনেক বড় বড় কাজ করা যায়। ঠাকুর প্রায়ই বলতেন, Will to do, Will to believe—তোমার ইচ্ছা শক্তিকে লাগাও কর্মে, কর্মটী সহজ হয়ে যাবে। তাকে প্রয়োগ কর বিশ্বাসের ক্ষেত্রে, এসে যাবে সহজ সরল বিশ্বাস। এখন, এই ইচ্ছা শক্তিকে প্রবল করা যায় কি ভাবে? তার জন্য প্রয়োজন সৎসঙ্গ, সৎগ্রন্থ পাঠ, মহাপুরুষ জীবন আলোচনা, জপ ধ্যান ইত্যাদি। তখন এই প্রবল ইচ্ছা শক্তি সহায়ে নিদ্রার চেতনেও জপ, ধ্যান চালিয়ে যেও বা সদসদ্ বিচারকে প্রহরী রেখে অবচেতনে লুকিয়ে থাকা পশুত্বকে জয় করা সম্ভব হবে। আর এইটাই হলো অবচেতনকে চৈতন্যময় করে তোলা।

Hypnotism অর্থাৎ একজনের ইচ্ছা শক্তি অপরের মধ্যে সঞ্চার করে প্রয়োগকারীর ইচ্ছানুসারে তাকে দিয়ে কাজ করান—কাজেই Hypnotismএর সাহায্যেও অবচেতনকে সংস্কার-মুক্ত করা যায়। ঠাকুরের কাছে নিবারণ নামে একটী ভক্ত আসত—তার ছেলে অঙ্ক পারত না। নিবারণ Hypnotism জানত—প্রয়োগ করল ছেলের ওপর—বল্, অঙ্ক পারব, আমি অঙ্ক পারব। এই ভাবে ইচ্ছা শক্তি তার মধ্যে সঞ্চার করার ফলে দেখা গেল ছেলেটা অঙ্কে first হলো। ঠাকুর শুনে বললেন, এসব করছ কেন, ওতে ক্ষতি হয়। তার চেয়ে ওটাকে ভগবৎ কাজে লাগালে ভাল হয়। দেখ, তোমার ছেলেকে বলছি—বল্, হরি রামকৃষ্ণ, হরি রামকৃষ্ণ। কিছুক্ষণ পর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলে ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করা হল, কি বলছিলি? বল্লো "হরি রামকৃষ্ণ"। ঠাকুর বললেন—দেখ ঠাকুরের নামটী ওর মনে গেঁথে গেছে, কত সহজ হয়ে গেছে। এতে ওর মঙ্গল হবে, কোন ক্ষতি হবে না—পশুত্ব দূর হয়ে যাবে। মানুষের অবচেতন মনে জমা আছে তার অখণ্ড স্মৃতি। পাশ্চাত্য দেশে সেই অখণ্ড স্মৃতি উদ্ধারের চেষ্টা চলছে hypnotismএর সাহায্যে।

আমাদের দেশে সাধু মহাপুরুষদের কাছে গেলে, তাঁদের সঙ্গে আলাপ করলে, তাঁদের ইচ্ছা শক্তি প্রভাবে তাঁদের সৎ বৃত্তিগুলি আমাদের মধ্যে এসে পড়ে। মহাপুরুষ বা অবতার পুরুষদের দিব্য সান্নিধ্যে তাই অবচেতনকে বশে আনা যায়।

স্মৃতি শক্তি অবচেতনকে জয় করার আর একটা বড় অস্ত্র। স্মৃতি শক্তিকে প্রখর করতে হবে। এমনো মহাপুরুষ আছেন যাঁদের প্রখর স্মৃতি শক্তি—তাঁরা বহু জন্মের স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলতে পারেন। জন্ম-জন্মান্তরের ইতিহাস বলতে পারেন। আমাদের দেশে বহু মহাপুরুষ ও বুদ্ধ প্রমুখ অবতারেরা পূর্বজন্ম স্মরণে আনতে পারতেন। অবশ্য তাঁরা পূর্বপ্রজ্ঞ—অবচেতনের কোন প্রশ্নই ওঠে না সেখানে। স্মৃতি শক্তি আমাদের পশ্চাৎ দিকে নিয়ে যায়, তার ফলে শুধু এ জন্মের নয়, পূর্ব পূর্ব জন্মের কথাও জানা যায়। অবচেতনে জমা থাকে যেহ মনের পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্মের ছাপ বা দাগগুলি। চেতনা বিলুপ্ত হলে মনে উঠে আসার এদের একটী শক্তি আছে। সুতরাং প্রখর স্মৃতি শক্তিবলে মনে এগুলো ওঠার আগেই ধরে ফেলতে হবে—মনের জোরে তাদের মোড় ফিরিয়ে দিতে হবে। অতএব অবচেতনকে জয় করতে হলে প্রখর স্মৃতি শক্তি লাভের চেষ্টাও করতে হবে।

এবার সংস্কারের কথায় আসা যাক। মনে সৎ, অসৎ দু রকম সংস্কারই আছে। অসৎ সংস্কারের

প্রকাশ যেখানে বেশী সেখানে সৎ সংস্কার সৃষ্টি করতে হবে। অবচেতনে বাসা বাঁধা মন্দ সংস্কারকে খণ্ডিত করতে হবে সৎকাজ, সৎ গ্রন্থ পাঠ, সৎসঙ্গ ও জপ ধ্যান সহায়ে।

অবচেতনকে জয় করার বা মন্দ সংস্কারকে নষ্ট করার আর একটা উপায়—মৃত্যু চিন্তা করা। লোভ, ভয়, ক্রোধ, ভালবাসা, ইত্যাদি সহজাত সংস্কার। লোভ, ভয়, ক্রোধ, এসব ত্যাগ করতে হবে। মৃত্যুকে জয় করতে পারলে এদেরও জয় করা সম্ভব। মানুষ নিজেকে ভালবাসে বলেই নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা তার এতো। আর এর থেকেই যত ভয়ের উৎপত্তি। সুতরাং নিজেকে রক্ষা করার ভাবটা ছাড়লে, ভয়ও চলে যাবে। তার একটা উপায়—নিজের মৃত্যু চিন্তা করা—তখন সাপ দেখলেও আর ভয় থাকবে না। আমাদের ঠাকুর তাই "সর্বদা মৃত্যু চিন্তা করবে" এই বাণীটী লিখিয়ে দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখাতেন। দেখো, এই প্রসঙ্গে একটী বেশ মজার গল্প মনে পড়ছে—

এক রাজসভায় একদিন একটী সাধু উপস্থিত। রাজা আলোচনা করছিলেন ভোগ বাসনা সম্বন্ধে। বলছিলেন, "ভোগ বাসনা আমার যায়নি—মনে বাসা বেঁধেছে--চরিতার্থ না করলে চলবে না। রক্ত মাংসের শরীর—ভোগ বাসনা তো থাকবেই।" এমন সময় সাধুটীকে দেখতে পেয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন রাজা—"আচ্ছা, আপনারা এগুলো বর্জনীয় করেন কি করে?" সাধু তখনই কোন উত্তর না দিয়ে পরে জানাব বলে চলে গেলেন। ছ' মাস পরে এসে বললেন, "মহারাজ, একটা ওষুধ দেব—আপনার ভোগবাসনা চরিতার্থ করার সহায়তা করবে। আমি দেখছি, ১৫ দিনের মধ্যে আপনার মৃত্যু। এই ওষুধটাতে যে কোন বাসনা চরিতার্থ সম্ভব। সুতরাং এটা এখুনি খেয়ে ফেলুন—সব বাসনা চটপট মিটিয়ে নিন। ৭ দিন পরে আবার আসব।" ৭ দিন পরে সাধু এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "ওষুধ খেয়ে ছিলেন মহারাজ?" এদিকে রাজার দেহ হয়ে গেছে ক্ষীণ—বললেন, "না, মৃত্যুই যখন, তখন ওটা আর খেয়ে কি হবে?" সাধু—খেয়ে নিন মহারাজ! তবু তো মনোমত ভোগবাসনা মিটিয়ে নিতে পারবেন। আবার তিন দিন পরে আসবো। ১০ম দিনে এসে দেখেন রাজার দেহ আরো ক্ষীণ হয়ে গেছে। রাজাকে আবার ওষুধটা খেয়ে তাড়াতাড়ি ভোগবাসনা মিটিয়ে ফেলার অনুরোধ করে ১০ দিনের মাথায় ফের আসব বলে সাধুটী প্রস্থান করলেন। ত্রয়োদশ দিবসে এসে দেখেন রাজার অবস্থা কঠিন। সাধু—"মহারাজ, আপনি কেন এমন করছেন? ওষুধ খেলেন না কেন? ভোগবাসনা মিটিয়ে নিলেন না কেন?" "নিরন্তর মৃত্যু চিন্তাই এর কারণ"—উত্তর দিলেন রাজা ধীর কণ্ঠে। তখন সাধুটী বললেন, "তাহলে বুঝলেন তো মহারাজ, এই মৃত্যু চিন্তা আমরা সর্বদা করি বলে ভয় লোভ বা ভোগবাসনা আমাদের আর থাকে না।" রাজা খুশী হয়ে সাধুটীকে পুরস্কার দিলেন।

অবচেতনকে জয় করার আর এক উপায় সত্য শিব সুন্দরের সাহায্য নেওয়া। যা কিছু সত্য শিব সুন্দর সর্বদা মনে তার চিন্তা রাখা। অবচেতনের যত আবিলতা, মলিনতা বা অশিব সংস্কার এই সত্য শিব সুন্দরের চিন্তায় পরিষ্কার হয়ে যাবে। কাজেই সত্য শিব সুন্দরের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে—সেগুলোর সঙ্গ করতে হবে। আমাদের ঠাকুর বলতেন, আকাশ থেকে উদারতা, ফুল থেকে পবিত্রতা, ঠাকুরের কাছ থেকে খানিকটা শক্তি টেনে নিতে হবে। এই সত্য শিব সুন্দরকে আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় মুখে ধরার চেষ্টা করতে হবে। নোংরা জিনিসে চোখ যাবে না—দৃষ্টি সেখান থেকে সরে আসবে। ঠাকুর বলতেন, "কলকাতার রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, কোন অশুভ বা অশিব বস্তুতে দৃষ্টি পড়তে যাচ্ছে, দেখি দৃষ্টি blurred হয়ে গেল—দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে নেবারও প্রয়োজন হলো না—চোখের সামনে যেন একটা পর্দা পড়ে গেল—physically সেটা যেন প্রকাশ হয়ে গেল—অশিব বস্তুটা দেখতে দিল না।" ঠাকুরের দেহ ও মন কেমন অঙ্গাঙ্গীভাবে এক হয়ে থাকত এটা তার এক সুন্দর দৃষ্টান্ত।

তাকাব যে ঘরে বা যেখানে থাকি সেখানে ভাল ভাল ছবি টাঙাতে হবে—এদিক ওদিক তাকালে চোখ ঐগুলিই দেখবে, যাতে জিনিসে চোখ পড়বে না। তাই করছি হাত দিয়ে—হাত যদি সত্য শিব সুন্দরের কাজ নিয়ে থাকে তো অশিব কোন কাজে আর সে হাত দিতে হবে না। তেমনি দেখা পড়া সকল বিষয়ে। এইভাবে ইন্দ্রিয়গুলিকে জয় করতে হবে। জাগ্রত করতে হবে আমাদের উর্দ্ধচৈতন্যকে। তবেই আমরা, স্বামী অভেদানন্দের ভাষায় যা বিরাট শক্তির কেন্দ্র স্বামী বিবেকানন্দ যাকে মহাকালীর সঙ্গে তুলনা করেছেন, সেই মহা-অবচেতনকে জয় করতে পারব—সক্ষম হব তার মোড় ফিরিয়ে দিতে। জয় ঠাকুর!

[সঙ্ঘ সভাপতি পূজ্যপাদ স্বামী নির্বেদানন্দজী রাত্রিকালীন নিত্য পাঠের সময় ঠাকুরের উপর্যুক্ত বাণীটির আলোচনা করেন।—ভাঃ সম্পাদক]

卐

বরষের প্রথম প্রণাম

"কালিবর"

হৃদয় বীণায় ঝংকৃত হোক সত্যানন্দ তোমারই নাম
রূপ মনোহর মূরতি মধুর হৃদে জাগে অবিরাম।
তোমার কৃপায় ধন্য হয়েছে আর্ত্ত তাপিত তৃষিত জন,
আঁধারের মাঝে তুমিত' দিয়াছ আলোকের সন্ধান।
ধরণীর ধূলি পবিত্র করেছ' তোমার পুণ্য পরশে,
ভক্তজন আজি তব জয়গাথা গাহিয়া উঠিছে হরষে।
আজি বরষের প্রথম প্রভাতে মোদের প্রণতি লও,
মধুর কণ্ঠে বলগো আবার—"কুল সুন্দর হও"।

পরম ভক্ত তাহারেই বলি

শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

একদা নারদ মনে মনে ভাবে, 'কোন ভক্ত আমার মতো'
প্রভুর চরণে এমন করিয়া করে নাকো' আত্ম নত।
আমার মতো ভক্ত আর নাই ত্রিভুবনত্রিসংসারে,
হৃদয় উজাড়ি ভক্তি ঢালিতে আর কেহ নাহি পারে।'
নারদ-মনের গোপন কথাটি ভগবান একদিন
জানিতে পারিয়া করিতে চাহিলেন নারদে গর্বহীন।
তাই একদিন নির্জনে বসি নারদে ডাকিয়া কাছে
বলিলেন, 'ওই বৃহ গাঁয়ে কৃষক সে এক শ্রেষ্ঠ ভক্ত আছে।'
শুনি সে কথা ঈর্ষা-আগুনে জ্বলিল নারদ মুনি,
'সারাদিন ধরে তব নাম করি, তবু এ কী কথা শুনি?'
প্রভুর অধরে মধুর হাসির রেখাটি উঠিল ফুটে,
বলিলেন, 'আলাপ করে এসো, সন্দেহ যাবে টুটে।'
তখনি নারদ স্বর্গ ত্যজিয়া মর্ত্য-মাটিতে আসি
কৃষক-কুটিরে নীরবে দাঁড়ালো, মুখেতে মধুর হাসি!
বেশ কিছুদিন কাছে কাছে থাকি নারদ সকৌতুকে
দেখিল কৃষক যেই ভোর হয় ছোটে যে মাঠের বুকে।
ঘুম থেকে উঠে শুধু একবার করে সে হরির নাম,
তারপর চলে চাষকাজ তার সারাদিন অবিরাম।
রাত যেই হয় ক্লান্ত কৃষক বিছানায় মাথা রাখে,
ঘুম চোখে আসে তবু একবার হরিকে তাহার ডাকে।
'এই ভক্ত? সারাদিন ধরে সংসার-কাজে যে-জন ব্যস্ত রয়
শুধু দুইবার হরিনাম করে, ভক্ত তাহারে কয়?
ভগবান বুঝি ভুল করি তারে ভক্ত বলিয়া ডাকে,
আর দেরি নয়, এখনি প্রভুর ভাঙিব ভুলটাকে।'
প্রভুর সমীপে ফিরে গেলো মুনি, বিনয়ে তাঁহারে কয়,
'ভক্ত সে নয়, ঘোর সংসারী—এর বেশী কিছু নয়।'
নীরব নয়নে মুখপানে চাহি ভগবান চুপ রহে,
তারপর ধীরে আসন ত্যজিয়া নারদ মুনিরে কহে,

'একবাটি তেল লও তুমি হাতে, অন্তত: একবার
এই পথ দিয়া ঘুরে এসো তুমি বাড়ির চারিধার।
খুব সাবধান, এক ফোঁটা তেল না পড়ে মাটির 'পর,
'তথাস্তু' বলি মুনি-প্রবর প্রদারিল দুই কর।
ক্ষণকাল পরে ফিরে এলো মুনি তেলের বাটিটি হাতে,
সব ঠিক আছে এক ফোঁটা তেল পড়েনিক' কোনমতে।
ফিরে এলে মুনি চকিত চমকে জিজ্ঞাসে ভগবান,
'ঘুরিবার কালে করবার তুমি করেছো নামগান?'
'সে কী কথা প্রভু? কানায় কানায় ভরতি তেলের বাটি,
চেয়ে আছি শুধু এক ফোঁটা তেল সিক্ত না করে মাটি।
তারি মাঝে কখন, বলে দাও প্রভু, করিব তোমার নাম?
তেল পড়ে ভয়, তার চেয়ে ভয় তোমার কথার দাম।'
সব কথা শুনি মৃদু হেসে কন স্বরূপের ভগবান,
'একবাটি তেল ভুলায়ে দিয়াছে ঈশ্বরের নামগান?
অথচ স্থাখ ওই দীন চাষা নানান কাজের মাঝে
রোজ দুইবার মোর নাম করে সকাল এবং সাঁঝে।'
'শতেক কাজের মাঝারে যে-জন ভোলে না হরির নাম
পরম ভক্ত তাহাকেই বলি', বলিলেন অভিরাম।

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথিত গল্প অবলম্বনে)

তোমার চরণ ছায়া-তলে

শ্রীনিবারণ চক্রবর্ত্তী

জীবন-স্রোত শুকিয়ে গেছে শুধুই এখন মরু
আশা বৈতরণী কূলে তুমি পারের গুরু।
তিমির ঘন সকল পথ
অচল চাকা চলেনা রথ
এবার আমার নূতন দেশে যাত্রা আমার সুরু।
কিসের মায়াডোরে বাঁধা ঘুরেছি অন্ধকারে
অর্থ-তত্ত্ব পাইনা খুঁজে বুঝাও তবে আমারে।
তোমার চরণ ছায়া-তলে
অনুতাপের অশ্রুজলে
সকল সত্তা ধাক্ দে গলে ওগো কল্পতরু॥

—•—

বৃক্ষ—প্রতিষ্ঠা

সুশান্ত সরকার

নাগরিক সভ্যতার কৃত্রিমতায় ক্লান্ত কবি প্রার্থনা করেন :—

"দাও ফিরে সে অরণ্য লও এ নগর
লও যত লৌহ, লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর।
হে নব সভ্যতা, হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী
দাও ফিরে তপোবন, পুণ্যছায়ারাশি,
গ্লানিহীন অতীতের দিনগুলি।" (রবীন্দ্রনাথ)

মানব জীবন ও অরণ্য জীবন—প্রাণের এই দুই মহান প্রকাশের মাঝে বাজে একটি ছন্দ। আর সেই ছন্দের মাঝেই জাগে আমাদের জীবন স্পন্দন। তাই বনভূমি ধ্বংস নয়, সৃষ্টিই প্রয়োজন। স্নিগ্ধ শীতল ছায়া, প্রাণের উৎসভূমি অক্সিজেন (অক্সিজেন) থেকে শুরু করে খাদ্য-বাসগৃহ- ঔষধ পত্র সবই অরণ্যের দান। অরণ্য ছাড়া পৃথিবী মরুভূমিতে পরিণত হত। অরণ্যই প্রাণের অগ্রদূত। অরণ্য ছাড়া পৃথিবীতে জীবন অচল।

তাই এই অরণ্য সৃষ্টির জন্যই ব্যাপকভাবে বৃক্ষ প্রতিষ্ঠার উৎসব করতে হবে। আমরা জানি বট ও অশথ বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হলে দুটি বৃক্ষের বিবাহ দান অতি পুণ্যজনক। গ্রামাঞ্চলে ধর্মপ্রাণ নরনারীরা এই বৃক্ষ প্রতিষ্ঠার ব্রত গ্রহণ করে সাধ্যমত অর্থব্যয় করে উৎসবের আয়োজন করেন। এই উৎসবের মধ্য দিয়ে বিশ্বপ্রকৃতির অনন্ত জীবন ছন্দের আনন্দঘন অভিব্যক্তিই দেখতে পাই।

এইসব ক্রিয়া-কর্মোপলক্ষে মাসেককাল পূর্ব থেকে নানাবিধ পণ্যভার নিয়ে দোকান পসারীরা যাতায়াত শুরু করে। অন্তঃপুরে কুম্ভকার পত্নী নূতন বরণডালা সাজিয়ে এনে দেয়, মালিনী নিত্য নূতন ফুলডালা যোগায়, ফুলসজ্জার জন্য নূতন নূতন ফুলের গহনা প্রস্তুত করে। নাপতানী বাড়ির বধূ ও দিদিঠাকুরানী-দের কোমল পদপল্লবে আলতা পরিয়ে দেয়, তাঁতিনী বিচিত্র বর্ণের নানা মনোহারিণী শাড়ি নিয়ে আসে। গোয়ালিনী দুধের যোগান দেয়, আর ব্রাহ্মণ ঠাকুরানী নিজের হাতে কাটা ক'গাছি পৈতার সূতা এনে দেন। এইভাবে উৎসবগুলির মাঝে পারস্পরিক শুভেচ্ছা ও মঙ্গল কামনারই প্রকাশ পায়। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন "যাহাতে আমার নিজের কিছুমাত্র আনন্দ আছে, সেই আনন্দটুকু যখন দশজনের মধ্যে বিতরণ করিতে চাহি, তখন উপলক্ষ্যের অভাব ঘটিবার কোনও কারণ দেখা যায় না।" বস্তুতঃ এই ব্যক্তিগত আনন্দই উৎসব উপলক্ষে সামাজিক আনন্দ হয়ে দাঁড়ায়। বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা উৎসবের উৎসও এই। "আমার আনন্দে সকলের আনন্দ হউক, আমার শুভে সকলের শুভ হউক, আমি যাহা পাই তাহা পাঁচজনের সহিত মিলিত হইয়া উপভোগ করি"—এই কল্যাণী ইচ্ছাই এই উৎসবের প্রাণ। আর এই উৎসবের মধ্য দিয়ে দেশের ধনসম্পদ বিকেন্দ্রীভূত হয়। ফলে জনগণের মাঝে অর্থনৈতিক বৈষম্য কমে। আর আন্তরিকতা, শুচিতা, সহযোগিতা, ও সেবাবুদ্ধি আশ্রয় করে কাজ করলে এইসব উৎসবের মধ্য দিয়ে

দেশ ও সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করা যায়।

আর একটি কারণেও এই বৃক্ষ প্রতিষ্ঠার উৎসব আমাদের করতে হবে। "আধুনিক বিজ্ঞানীদের ন্যায় ভারতীয় প্রজ্ঞাবান ঋষিদেরও দূরদৃষ্টি ছিল। তাঁরাও জানতেন—ভূপৃষ্ঠস্থ বনরাজি আকাশে ভ্রাম্যমান মেঘরাশিকে বর্ষণের জন্য নিয়ে আকর্ষণ করে। যেখানে বন বন বেশী, সেখানে বর্ষণও বেশী। সেই জন্য তাঁরা নানান স্থানে তপোবন গড়ে তুলে দেশের কল্যাণের জন্যই জীবনের সাধনা করে গেছেন।

সুতরাং কৃষির উপযোগী বর্ষণের স্বার্থেই দেশের বনসম্পদ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। ছায়া, ফল, ওষধি, কাষ্ঠাদির জন্যও নানা শ্রেণীর বৃক্ষের প্রাচুর্য চাই। এক সর্বাত্মক উদ্দেশ্যের পরিপোষক রূপেই বৃক্ষরোপন ও বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা উৎসব পুণ্যজনক। তাই আজকাল সরকারীভাবে বন-মহোৎসব উদযাপন করা হচ্ছে।"

— • —

বাণী-বীথিকা

বুদ্ধ ও বিশ্বকবি

"বর্তমান কলহের বিষয় অনুসন্ধান না করিয়া সঙ্ঘ যদি শান্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করেন, তাহা হইলে উহা উচিত ও বিধিসঙ্গত হইবে না।

দুই প্রকারে শান্তির প্রতিষ্ঠা সম্ভব ; প্রথম মৌখিক, দ্বিতীয় মৌখিক এবং আন্তরিক।

বর্তমান কলহের মূল অনুসন্ধান না করিয়া সঙ্ঘ যদি শান্তির প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করেন তাহা হইলে ঐ শান্তি মৌখিক হইবে। কিন্তু যদি সঙ্ঘ ঐ অনুসন্ধান সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত করিয়া একতার ঘোষণা করেন, তাহা হইলে মৌখিক ও আন্তরিক উভয়বিধ একতাই প্রতিষ্ঠিত হইবে।

যে একতা মৌখিক ও আন্তরিক, ঐ একতাই যথার্থ ও বিধিসঙ্গত।"

—বুদ্ধ—

জনগণের ভাগ্য যদি তাদের সম্মিলিত ইচ্ছার দ্বারাই সৃষ্ট ও পালিত না হয় তবে সেটা হয় খাঁচা. দানাপানি সেখানে ভালো মিলতেও পারে, কিন্তু তাকে নীড় বলা চলে না, সেখানে থাকতে থাকতে পাখা যায় আড়ষ্ট হয়ে। এই নায়কতা শাস্ত্রের মধ্যেই থাক, গুরুর মধ্যেই থাক, আর রাষ্ট্র-নেতার মধ্যেই থাক মনুষ্যত্বহানির পক্ষে এমন উপদ্রব কিছুই নেই।

অতিশয় শক্তি অতিশয় অশক্তির বিরুদ্ধে চিরদিন নিজেকে বাড়িয়ে চলতেই পারে না। ক্ষমতাশালী যদি আপন শক্তিমদে উন্মত্ত হ'য়ে না থাকতো তাহলে সবচেয়ে ভয় করতো এই অসাম্যের বাড়াবাড়িকে, কারণ অসামঞ্জস্য মাত্রই বিশ্ববিধির বিরুদ্ধে।"

—বিশ্বকবি—

— • • • —

গীতার বাণী

সাধনাপুরী

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৪ : ৩৭

হে অর্জুন! যথা (যেমন) সমিদ্ধঃ অগ্নিঃ (প্রজ্বলিত অগ্নি) এধাংসি (কাষ্ঠ সকল) ভস্মসাৎ কুরুতে (ভস্মীভূত করে), তথা জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি (কর্ম সমূহকে) ভস্মসাৎ কুরুতে (ভস্মীভূত করে)।

হে অর্জুন, যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে, তেমনি জ্ঞানরূপ অগ্নি কর্মরাশিকে ভস্মসাৎ করে।

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতে

সম্যক প্রদীপ্ত অগ্নি যেমন ইন্ধন অর্থাৎ কাষ্ঠাদি বস্তুসকলকে ভস্মীভূত করে তেমনি জ্ঞানাগ্নিও সকল কর্মরাশিকে ভস্মীভূত করে। জ্ঞানাগ্নি অনাদিকাল প্রবৃত্ত সঞ্চিত কর্ম ভস্মসাৎ করে (রামানুজ)। জ্ঞানাগ্নি প্রারব্ধ কর্মফল ভিন্ন সর্বকর্ম ভস্মসাৎ করে (শ্রীধরস্বামী)। জ্ঞানাগ্নি প্রারব্ধ কর্ম ভিন্ন পাপ পুণ্য সমুদয় কর্ম ভস্মসাৎ করে, অর্থাৎ তাদের কারণ অজ্ঞান বিনাশ দ্বারা বিনষ্ট করে ভবিষ্যৎ কর্ম (মধু)। আরব্ধ ব্যতীত সঞ্চিত ও ক্রিয়মান পাপ ও পুণ্য ধ্বংস করে (বলদেব)। প্রারব্ধ কর্ম উপভোগের দ্বারা ক্রমে নষ্ট হয়। কিন্তু যে সঞ্চিত কর্মের ফল জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বে অতীত অনেক জন্মকৃত কর্মের ফল এ জন্মে ফলতে আরম্ভ হয় নাই তাই জ্ঞানোদয়ে ভস্মীভূত বা নির্বীজ হয় (শঙ্কর)। এই অনুরূপ শ্লোক শ্রুতিতেও আছে 'বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ, ২।২৬ পাতঞ্জল দর্শন।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে ॥ (মণ্ডুক, ২।২।৮)

বেদান্ত দর্শনে আছে—'তদধিগম উত্তর পূর্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ। ইতরস্যাপ্যেবমসংশ্লেষঃ পাতেত্বিতি ॥" (বেদান্তসূত্র, ৪।১।১৩—১৪)।

আচার্যেরা সকলে প্রারব্ধ ব্যতীত সকল কর্ম ভস্মীভূত হওয়ার কথা বলেছেন কিন্তু গীতার অর্থ এতে সঙ্কীর্ণ হয়ে যায়। সর্ব শব্দে কোন কর্ম বা কর্মফল বাদ দেয় নাই। এই স্থলে শরীর ধ্বংস হবার প্রয়োজন হয় না, এইটাই দিব্যজীবনের আধারে পরিণত হয়। এইটাই বৈদান্তিক গ্রন্থ হিসাবে গীতার বৈশিষ্ট্য ও মহত্ত্ব। সর্বকর্মভস্মসাৎ অর্থাৎ কোন কর্মই তখন আর বন্ধনের কারণ হয় না, সম্পাদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোন প্রতিক্রিয়া না রেখেই বিলীন হ'য়ে যায় (শ্রীঅরবিন্দ)।

জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা

জ্ঞানাগ্নি কিরূপে কর্মরাশিকে ভস্ম করে এটা একটী বোঝবার জিনিস—অজ্ঞান থেকেই সাধারণ মানুষের কর্ম প্রেরণা আসে, বাসনা কামনা থেকেই মানুষের কর্ম প্রেরণা আসে! জ্ঞান এই অজ্ঞান, কামনা বাসনা

ইত্যাদিকে ধ্বংস করে দেয়—সর্বত্র ব্রহ্মানুভূতি হলে সর্ব কর্মবন্ধনের অবসানও হয়। এটীকেই ভগবান ভস্মসাৎ অর্থে ব্যবহার করেছেন। (বেদজ্ঞকথা)।

বিজ্ঞানে বলে ignition point এর আগে heat এর কোন flame দেখা যায় না। উপযুক্ত এর বেশী হলে flame দেখা যায় কাজেই এই Point এর ওপরে যত heat বাড়বে তত flame প্রজ্বলিত হবে এবং তখনই আগুনে সব কিছু ভস্ম করে ভস্ম করার কথা। এখন এই ignition point বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন রকমের—Paraffin এর এক রকম, কাঠের এক রকম, এবং এগুলি পদার্থভূত হ'লে ভস্মে পরিণত হয় অর্থাৎ এমন বস্তুতে পরিণত হয় যে, যার পর আর কোন বস্তুতে এ reduced করা যায় না। গীতায়তেও তাই যখন ignition point অর্থাৎ ভগবৎ লাভ হবে তখন কর্ম পদার্থভূত হবে অর্থাৎ তখন আর বন্ধনের কারণ হবে না—গীতায়তে ব্রহ্মবৎ হওয়াই রূপান্তরিত বস্তুর অবস্থা। এই অবস্থায় কেবল ব্রহ্মবৎ হওয়া। "নিমিত্তমাত্রং ভবসব্যসাচী" একাদশ অধ্যায়ের ৩৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য। (বেদজ্ঞকথা)।

কাঠে অগ্নি সংযোগ করলে কার্বন-ডাই অক্সাইড্ (CO_2) ইত্যাদি উৎপন্ন হয় এবং পড়ে থাকে ছাই। কাঠের মূল উপাদান কার্বনে থাকে ৬টি ইলেকট্রন। রাসায়নিক বিক্রিয়ার পর তারা সমতা প্রাপ্ত হয়। তেমনি জ্ঞানাগ্নি আমাদের সমস্ত কর্ম ভস্ম করে অর্থাৎ মন তখন সমতা প্রাপ্ত হয় বা স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়, বৈষম্য চলে যায়। এটী জ্ঞানপন্থীদের মতে আর ভক্তিমতে জীব তখন নিত্য কৃষ্ণ দাস হয়ে যায়। (বেদজ্ঞকথা)

পথিক

শ্রীমাধুরীপুরী

দূরের পথিক আমি
আছি বহু দূরে
তবে মিলিত হইব প্রভু
তব "শুভনীরে"।
জীবনের শেষ সাধ
তোমারে জানাই
ও রাঙা চরণ প্রান্তে
দিও মোরে ঠাঁই।

মোর চলার পথে
ধূলি হয়ে থাকি।
(মোর) জনম সফল হবে
পদচিহ্ন মাখি।
অনাথ 'ঠাকুর' যত
কর ঠাকুরালি
অনুভব যন্ত্র কর
প্রেমদীপ জ্বালি।

যোগ ও যুগাচার্য্য

স্বামী শিবানন্দ

)

ঋষিগণ যেমন প্রাণশক্তিকেই পরমাত্মার শক্তিবলে অভিহিত করেছেন তেমন প্রাণ হতেই ভূতবর্গের উৎপত্তি একথাও তাঁরা উপনিষদের বহুমন্ত্রে আলোচনা করেছেন, তৈত্তিরীয়োপনিষদে ভৃগুবল্লী অধ্যায়ে তৃতীয় অনুবাকে বলা হল,—প্রাণো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। প্রাণাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। প্রাণেন জাতানি জীবন্তি। প্রাণং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। প্রাণই ব্রহ্ম, প্রাণ হতেই ভূতবর্গের উৎপত্তি। উহাদের প্রাণের দ্বারাই বর্দ্ধিত হয়, অবশেষে প্রাণাভিমুখে গমন করে এবং প্রাণেই লীন হয়।

এই অদৃশ্য প্রাণশক্তি হতে ভূতবর্গের উৎপত্তি, স্থিতি এবং পরে জীব শরীর হতে প্রাণ কি ভাবে উৎক্রমণ করে এবং এই প্রাণকে অবগত হয়ে কি প্রকারে শ্রেয় লাভ করা যায় তাও উপনিষদে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে।

প্রশ্নোপনিষদে আমরা দেখি এক সময় ঋষিগণ এ বিষয়ে ভগবান পিপ্পলাদের নিকট প্রশ্ন করেছিলেন,—ভগবন্ কুত এষ প্রাণো জায়তে, কথমায়াত্যস্মিঞ্চ শরীর আত্মানং বা প্রবিভজ্য কথং প্রাতিষ্ঠতে, কেনোৎক্রমতে, কথং বাহ্যমভিধত্তে, কথমধ্যাত্মম্? (প্রশ্ন : উঃ—৩।১)

ভগবান পিপ্পলাদ প্রশ্নকারী ঋষিকে ভূয়সী প্রশংসা করে বল্লেন,—আত্মন: এষ প্রাণো জায়তে। পুরুষে ছায়া, এতস্মিন্নেতদাততং মনোকৃতেনায়াত্যস্মিঞ্চ শরীরে। (প্রশ্ন : উঃ—৩।৩)

পরমাত্মা হতে প্রাণ জন্মগ্রহণ করে। পরমাত্মার সহিত এই প্রাণের ছায়া কায়ার সম্বন্ধ। প্রাণ মুখ্যতঃ পরমেশ্বরেরই শক্তি, সে সঙ্কল্প ও কর্ম্মানুসারে শরীরে আগমন করে। ঋষি আরও বল্লেন :—পরমাত্মা আপন সংকল্পের দ্বারা প্রাণরূপে মানব শরীরে আগমন করেন এবং সম্রাট যেমন আপন কর্ম্মচারীবৃন্দকে বিভিন্ন স্থানে যথোপযুক্ত কর্ম্মে নিয়োজিত করেন তেমন মুখ্য প্রাণ অপর প্রাণদিগকে শরীরের পৃথক পৃথক স্থানে নিয়োজিত করে। মনুষ্য শরীরে মুখ্যপ্রাণ বিভিন্ন শিরা উপশিরা নাড়ী অবলম্বনে অপান, সমান, ব্যান, উদান এগুলির সাহায্যে বিভিন্ন কর্ম্ম সম্পাদন করে। তিনি সর্ব্বাত্মক—যিনি পঞ্চ প্রাণের বিষয় অবগত হন, তিনি অলৌকিক শক্তির অধিকারী হন, আর যিনি প্রাণের উৎপত্তি, আগমন অবস্থিতি উৎক্রমণ প্রভৃতির উপর আধিপত্য লাভ করেন তিনি অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন।

উৎপত্তিমায়তিং স্থানং বিভুত্বঞ্চৈব পঞ্চধা
অধ্যাত্মং চৈব প্রাণস্য বিজ্ঞায়ামৃতমশ্নুতে। (প্র: উঃ—৩।১২)

ঋষি অন্যত্র প্রজ্বলিত অনল হতে স্ফুলিঙ্গের উৎপত্তির মত অক্ষর ব্রহ্ম হতে প্রাণের উৎপত্তির কথা বলেছেন এবং উপনিষদের বহুমন্ত্রে প্রাণকে ভূতগণের আয়ু বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। 'প্রাণোহি ভূতানামায়ুঃ' ইত্যাদি এবং সকল জীবই এই প্রাণের অধীন। ঋষিদের মতে প্রাণের প্রথম অভিব্যক্তি আকাশে। প্রাণই আকাশ বায়ু সূক্ষ্ম অবস্থা হতে পর্য্যায়ক্রমে স্থূল ও জড় বস্তুতে পরিণত হয়েছে। সমস্ত কিছুই অনন্ত প্রাণরূপী আকাশ মহাসমুদ্রের

সহিত সংযুক্ত এবং প্রলয়ে এই প্রাণ আকাশেই বিলীন হয়। দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর বলেন—"তিনি চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন—যাহাই নিত্য তাহাই লীলা—নিত্য থেকে লীলা আরম্ভ হল—মহাকারণ থেকে স্থূল, সূক্ষ্ম কারণ শরীর দেখা দিল—সেই তুরীয় থেকে জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি—সব অবস্থা এসে পড়লো। আবার মহাসমুদ্রের ঢেউ মহাসমুদ্রেই লয় হলো।" (শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাকথা ও কাহিনী পৃঃ ২৫৪)

প্রাচীন ঋষি বর্ণিত অবিনাশী, অমৃত, সর্ববাপী, সর্বানুস্যূত এই প্রাণতত্ত্বের এক অপূর্ব বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আমরা পাই শ্রীরামকৃষ্ণ সন্তান স্বামী বিবেকানন্দের ও স্বামী অভেদানন্দের রচিত যোগগ্রন্থ সমূহে। বিশেষতঃ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ যোগমার্গের উচ্চতত্ত্বগুলি অত্যন্ত নিপুণ ভাবে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর ব্যাখ্যার কৌশল প্রণালী ও যুক্তিতে যে কোন বৈজ্ঞানিক মনের যোগমার্গে আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। বিজ্ঞানের সহিত যোগের এই মৈত্রী বন্ধন এ যুগের যুগাচার্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান। স্বামী অভেদানন্দ বলেন—যোগশাস্ত্র স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে কোন জড়শক্তি নয়, প্রাণই বিশ্বপ্রকৃতির চরমকারণ। এই প্রাণশক্তিই অণুপরমাণুর গতি ও স্পন্দনের হেতু, প্রাণের স্পন্দনের বেগের ও গতির তারতম্য হতেই রঙ ও তেজনের, সূক্ষ্ম ও স্থূলের পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। তিনি ব্রহ্মতত্ত্বকে চৌম্বকাকর্ষণ দৃষ্টান্ত দ্বারাদ্বারা বুঝিয়েছেন, তারই অদৃশ্য শক্তিতে সমস্ত কিছু স্পন্দিত হয়ে স্তরে স্তরে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন নাম রূপের আকার ধারণ করেছে। ১৯০১ সালে আমেরিকায় প্রাণায়ামতত্ত্বের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন—The 'Prana', when it moves the universe, is called the cosmic 'Prana', or the life—principle of the universe, and when it moves the individual body, it becomes the individual prana. ...The manifested vibration of the prana is called by different names, such as gravitation, the heat, electricity, the magnetism and so forth. * * * The finest manifestation of the vibrating prana is the mind, and the grossest manifestation is the matter.

যখন এই প্রাণ নিখিল জগৎস্পন্দনের ক্রিয়া করে তখন তাকে আমরা মূলাপ্রাণশক্তি বা বিশ্বপ্রাণ বলি, স্বতন্ত্রভাবে জীবদেহে ক্রিয়াশীল হলে তাকে বিভিন্ন প্রাণ বা প্রাণী বলে উল্লেখ করা হয়। এই অভিব্যক্ত প্রাণশক্তির কোনটির নাম মাধ্যাকর্ষণ, কোনটির নাম তাপ, কোনটি তড়িৎ, কোনটি চৌম্বকাকর্ষণ ইত্যাদি। মনে তার সূক্ষ্মতম প্রকাশ এবং জড়বস্তুর মধ্যেই তার স্থূলতম অংশ। স্বামী অভেদানন্দ বলেন, এই বিশ্বপ্রাণের স্পন্দনে অণুপরমাণুতে এই শক্তিই কেন্দ্রীভূত হয়ে দেশে কালে বিভিন্ন বস্তু ও জীবনের কারণ হয়। তাঁর মতে কেন্দ্রের স্পন্দন অতি সূক্ষ্ম এবং দ্রুত। বৃত্তের স্পন্দন স্থূল এবং মৃদু। বিজ্ঞানের মতে অণুপরমাণুর দ্রুত স্পন্দন ও মৃদু স্পন্দনের ঘনত্বের পরিমাণের পরিমাণেই বস্তুর পার্থক্য প্রমাণিত হয়। স্থূল বস্তু সমূহ তার বহিস্তর, মন তা থেকে আত্মার নিকটবর্তী এক সূক্ষ্ম স্তর, এবং আত্মাই তার কেন্দ্র। আলো, উত্তাপ, রঙ প্রভৃতির পার্থক্য পদার্থ বিজ্ঞানীরা যেমন অণুপরমাণুর স্পন্দন পার্থক্য হতে প্রমাণ করেছেন, তিনি সেই সূত্রে জগতের স্থূল ও সূক্ষ্মের পার্থক্য প্রমাণ করেছেন। প্রাণের স্থূল রূপগুলিকে বাহ্য উপায়ে জয়ের চেষ্টাই পদার্থ বিজ্ঞানের লক্ষ্য এবং প্রাণের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শক্তিকে মনোসংযমের দ্বারা জয়ের প্রচেষ্টাই যোগ।

জড় শরীরে যে প্রাণশক্তি মেরুদণ্ডের স্নায়ু কেন্দ্রে অবস্থিত তা মোটামুটি আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। প্রাণায়ামের দ্বারা স্নায়ুকেন্দ্রের অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তির ওপর যোগিগণ কি করে আধিপত্য বিস্তার করেন এবং সে সম্বন্ধে যুগাচার্য্য স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত সমূহ নিয়ে আগামী সংখ্যায় আমরা আলোচনার চেষ্টা করব। (ক্রমশঃ)

বেদচ্ছন্দা

সঙ্কলয়িত্রী—সাধনাপুরী

৫ই নভেম্বর— ১৯৫৮ সাল।

শ্রীঠাকুর ভক্ত সঙ্গে বসে আছেন। স্বর্গিম তনু—শ্রীমুখে ঝরে পড়ছে করুণার অমিয়া। আজ কথা প্রসঙ্গে প্রাচ্য দর্শনের সৃষ্টিতত্ত্ব ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে দুচারটী কথা বললেন। যার দুএক টুকরো এখানে লিপিবদ্ধ হল।

ঠাকুর—আমাদের শাস্ত্র (হিন্দুশাস্ত্র) পাশ্চাত্ত্যের Evolution theoryর বিরোধী—আমাদের শাস্ত্রে বলে আমরা ভগবানের অংশ আর পাশ্চাত্ত্য সাহেবদের মতে আমরা ইউনিসেলুলার প্রোটোপ্লাজম থেকে হয়েছি—অর্থাৎ নীচে থেকে ওপরে ওঠা। আর আমাদের হচ্ছে ওপর থেকে নীচে নামা। ওদের evolution আর আমাদের devolution.

জনৈক—তবে যে আমাদের শাস্ত্রে বলে ৮৪ লক্ষ জন্ম পরিক্রমার পর মানুষ জন্ম—এটা কি ঠিক?

ঠাকুর—দেখ অনেক পুরাণের অনেক মত, আবার গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রের অনেক মত। ক্ষিতি, অপ, তেজ মরুৎ ব্যোম—এই পঞ্চীকরণের সংমিশ্রণে এই ব্যবহারিক জগৎ। আবার আত্যন্তিক জগৎও আছে। ব্যবহারিক জগতে খাওয়া পরা ইত্যাদি চলে আর আত্যন্তিক জগৎ হচ্ছে জ্ঞানের জগৎ নিখাদ জগৎ—মন বুদ্ধি অহং এর খেলা চলে—যদিও তার বহিঃপ্রকাশ এই ব্যবহারিক জগতে দেখা যায়।

আসলে আমাদের মূল কথাগুলি মনে করতে হবে। ওদের সঙ্গে আমাদের তফাৎ হলো—আমরা বলবো এই জগৎটা হয়েছে চৈতন্য স্বরূপ ভগবান থেকে ওরা কিন্তু বলবে এই জগৎটা হয়েছে জড় থেকে। আমরা বলবো যে আমরা ঋষিপুত্র ওরা বলবে যে বাঁদরের পুত্র—বাঁদরের evolution মানুষ। তবে সাধকের ধর্মরাজ্যে ক্রমোন্নতি আছে সে কথা আলাদা।

৫ই নভেম্বর ১৯৫৮—অন্য সময়।

শ্রীঠাকুর—আসনে উপবিষ্ট—শ্রীমুখ প্রসন্ন—গুচি সুন্দর দেবতনু। বয়সা মেয়ের নীল দুটী চোখ মেলে দেখছেন গঙ্গার শোভা। কথামৃত পাঠ করে চলেছেন মাস্টারমশাই—

শ্রীরামকৃষ্ণ—পাশবদ্ধ জীব, পাশমুক্ত শিব। ভগবানের প্রেম দুর্লভ জিনিষ। প্রথমে স্ত্রীর যেমন স্বামীতে নিষ্ঠা, সেরূপ নিষ্ঠা যদি ঈশ্বরেতে হয় তবেই ভক্তি হয়। .....তারপর ভাব.....বাহ্য, স্থির হয়ে যায়।

"প্রেম হওয়া অনেক দূরের কথা। চৈতন্যদেবের প্রেম হয়েছিল। ঈশ্বরে প্রেম হলে বাহিরের জিনিষ ভুল হয়ে যায়। জগৎ ভুল হয়ে যায়। নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিষ—তাও ভুল হয়ে যায়।"

আমাদের ঠাকুর এই কথা শুনে বললেন—

ঠাকুর—ঈশ্বরে প্রেম এটী জীবের হয় না—কাজেই বোঝাও যায় না। তবে বাড়ীতে একটী ছোট্ট

সুন্দর বাচ্চা থাকলে তাকে থেকে থেকে দেখতে ইচ্ছা করে, বুকে জড়িয়ে ধরতে চুমো খেতে মনে হয়, এই প্রীতিটা বুঝি—এই রকম ঈশ্বরের জন্য মন ছটফট করা প্রীতি এসব ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন হয় না। সমস্ত বস্তুর ওপর প্রীতির Instinct সেটা ঠাকুরের দেওয়া Instinct আর ঈশ্বর বা ইষ্ট বস্তুর ওপর প্রীতির instinct এটিও ঠাকুরের বিশেষ কৃপা, এটির জন্য প্রার্থনা করতে হয়। আর কৃপা যদি নিজে থেকে করেন সে কথা তো আলাদা।

গোস্বামী প্রভু প্রথম জীবনে শ্রীকৃষ্ণ মানতেন না, ভক্তিও ছিল না—গোঁড়া ব্রাহ্ম সমাজ ভুক্ত ছিলেন কিন্তু পরবর্তী জীবনে মস্ত বড় ভক্ত হয়ে গেলেন—এত নাম করতেন যে অঙ্গে আসনে নাম আপনিই ফুটে উঠতো। আর ভগবানের নামে অজগর বৃত্তির মত নিয়ে ছিলেন। পরের দিনের জন্যে কিছু সঞ্চয় করতেন না। আকাশবৃত্তি নিয়েছিলেন। গৃহদেবতা শ্যামসুন্দর নিজে থেকে কৃপা করে দর্শন দিয়ে দিয়ে গোস্বামী প্রভুর জীবনে আনলেন আমূল পরিবর্তন।

৬ই নভেম্বর ১৯৫৮।

রাত্রিবেলা শ্রীঠাকুর বসেছেন গঙ্গাতীরের বারান্দায়—সামনে বসেছেন সেই সব ত্যাগী সন্তানের দল যাঁরা শ্রীঠাকুরের প্রীতির জন্যে জলে যাওয়ার মন্ত্র করেছেন গ্রহণ। শ্রীঠাকুর আধ্যাত্মিক জটিল প্রশ্নাবলীর সমাধান করে চলেছেন। সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীর দল সকলে একে একে করলেন গীতা পাঠ। কথায় কথায় প্রশ্ন উঠলো মুক্ত পুরুষের হত্যা কার্যেও পাপ স্পর্শ করে না।

ঠাকুর—এখানে দুটো কথা মনে রাখতে হবে—একটা হচ্ছে Ideal আর একটি হচ্ছে Practical এইখানে এই যন্ত্রটা যে ভগবান বললেন এটা Ideal রাজ্যের কথা কিন্তু Practical রাজ্যের কথা হচ্ছে মুক্ত পুরুষ খুন করতে পারেন না। যেমন লোহার তরবারী যদি সোনার হয়ে যায় তখন তাতে আর হিংসা কাজ হয় না। তেমনি মুক্ত পুরুষের দ্বারা কোন হিংসা কাজ হয় না, তারা হত্যা করলেও পাপ স্পর্শ করে না এটা Ideal.

এরপর কথায় কথায় মহাপুরুষদের সেবা করার কথা উঠলো—

ঠাকুর—যারা মহাপুরুষদের সেবা করে তারা মহাপুরুষদের পুণ্যের কিছু অংশ পায়। মহাপুরুষদের কৃপায় তাদের নিজ কর্মফল পাপ ইত্যাদি অনেক খণ্ডিত হয়ে যায়। কিন্তু সেবা করার মধ্যে আন্তরিক শ্রদ্ধার ভাবটা শেষদিন পর্যন্ত বজায় থাকা চাই আর সেবা করার মধ্যে সেবাপরাধ যেন না হয়।

৭ই নভেম্বর ১৯৫৮।

নিরুদ্বেগ আনন্দময় দিন। সাধু ও গৃহী উভয় ভক্তের দলই শ্রীচরণান্তিকে উপস্থিত।

সংখ্যা লঘিষ্ঠ ধনতান্ত্রিক যুগের কবে হয়েছে অবসান। দেশে বিদেশে communism মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে—দীন মুটে মজুর ছাত্রসমাজ সকলের রক্তে আজ আগুন ধরা নেশা—আমাদের সাথী মানতে হবে শ্লোগান সকলের মুখে—এমনি পটভূমিকায় শ্রীঠাকুর উপদেশ দান. রঙ্গ রহস্য, প্রশ্ন মীমাংসা সবই করে চলেছেন যদিও আশ্রম ভূমি সে আবহাওয়া থেকে আজও মুক্ত।

শ্রীঠাকুর নিজের আসনে আছেন বসে—চন্দ্রকান্তমণির দ্যুতি করে পড়ছে শ্রীমুখ বেয়ে। কৃষ্ণকান্ত মেঘের মত করুণাসজল দৃষ্টি। আর শ্রীমুখে লেগে রয়েছে এক টুকরো হাসি।

ঠাকুর—বর্তমান সমাজে চাহিদা অনুসারে mass appeal করার চেষ্টাটা বক্তৃতা সাহিত্য ইত্যাদি সর্বত্রই বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখনকার কবিতায় 'রাজপুরীতে বাজাই বাঁশী' বলা চলবে না। সে জন্য দেখ ভবিষ্যৎ দর্শী শ্রীঠাকুর, স্বামিজী এঁদের বিরাট মনে দীন নারায়ণের সেবার ভাবধারা, দেশ মাতৃকার উন্নতি সাধন আমাদের আদর্শ ইত্যাদি বাণী রেখেছিল।

ঠাকুরের মনে দীন নারায়ণের সেবার প্রয়োজন বোধ জাগায়—ভাখো, সারা জগতের মনীষীদের মধ্যে

এই ভাবধারা ছড়িয়ে পড়ে। কণ্বো, টলষ্টয় ইত্যাদি ঋষি প্রতিম পুরুষদের মনেও সেইজন্যে দেখি জনকল্যাণের ইচ্ছা জেগেছিল। শ্রীঠাকুর, শিবাবতার স্বামীজী এঁদের বিরাট ইচ্ছার প্রভাবেই আজ দেশে দেশে দিকে দিকে দীন নারায়ণদের জন্যে গড়ে উঠেছে বিস্তারিত আরোগ্যালয় ইত্যাদি।

এরপর আরও দু চার কথা হতে হতে ঠাকুর একটু রঙ্গচ্ছলে তাঁরের প্রতি—

ঠাকুর—মাষ্টার মাতালের আনন্দ দেখেছ ?

তার—(ছেলেমানুষের মত খুব খানিকটা হেসে) খুব দেখেছি ঠাকুর—যে পাড়াতে থাকতাম সিউড়ীতে—সে পাড়াতে তো খুব মাতালের বাস ছিল। তা দেখেছি মাতালগুলো খুব আনন্দেই থাকে, কোন দিকে খেয়াল নেই—দিন না রাত্রি—রাস্তা না নর্দ্দমা—খুব খোশ মেজাজেই থাকতে দেখেছি—অবশ্য অন্য দিকও তাদের থাকে—তবে ওই আনন্দটা বেশ লাগত।

ঠাকুর—(খুব হাসতে হাসতে)—দেখো বাপু খুব সাবধান, অমন ভালো লাগা ভালো নয়। কোনোদিন খেতে মন হয়নি তো ?

তার—(বেশ একটু জোরের সঙ্গে হাসতে হাসতে) না ঠাকুর—। সে ইচ্ছা কোনোদিন হয়নি, আপনার কৃপাও পেয়েছি আর বাপের মুখে সময়ে সাবধান বাণী "সুরা আর নারী এ দুটী থেকে তফাৎ থাকবে তো" ওই কথা আমার খুব মনে পড়ত।

ঠাকুর—(হাসতে হাসতে) মুচকিরাম অমনি খুব খানিকটা খেয়ে আসতো এসে নেশায় বুঁদ হ'য়ে বসত আর আমাকে বলতো' খুঁটুবাবু এক বলটিন্ (বালতি) কেঁয়ে আলম্।

স্যাখো এই প্রসঙ্গে রামেলের কথা মনে পড়ছে। 'রামেল' বলেছেন সাধুর আনন্দ আর মাতালের আনন্দ তো এক। দিলীপবাবুকে বলেছিলেন—মাতাল মদের জন্য অধীর হয় আর সাধু ভগবৎ আনন্দের জন্য অধীর হয়। সাধু ভগবৎ লাভের জন্য সব ত্যাগ করে, বিসর্জ্জন দেয় আর মাতালও মদের নেশায় অধীর হয়ে বিষয় সম্পত্তি সব তুলতে বসে। কাজেই এদের আনন্দের মধ্যে তফাৎ কোথায় ?

জনৈক ভক্ত—ঠাকুর, মাতালের আনন্দের মধ্যে জ্বালা আছে। আইনষ্টাইন একটা theory আবিষ্কার করে যে আনন্দ পাবেন, মাতাল সে আনন্দ পাবে না।

ঠাকুর (হাসতে হাসতে)—কেন ? সাধুরাও কি কম জ্বালা ভোগ করে না কি ? মহাপ্রভু সারাজীবন জ্বলে গেলেন। সনাতন গোস্বামীর গায়ের জ্বালায় যে গাছতলায় বসতেন তার পাতাগুলো পর্য্যন্ত পুড়ে যেত। দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর বারো বছর মাথাকাটা তপস্যা করলেন। স্বামীজীরা প্রত্যেকে কি কম জ্বালা ভোগ করেছেন। ভক্তেরাও ভগবানের জন্য কম জ্বালা ভোগ করে না কি ?

তোমরা তোমাদের চিন্তাগুলোকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করে নাও। spiritual conceptionকে বেশ clear করে নাও। আমি এইটীই চাইছি। তোমাদের হয়তো কেউ বুঝিয়ে দেবে আর তোমরা তাই বুঝে চলে আসবে এ আমি চাই না।

ভক্ত—ঠাকুর, মাতালের আনন্দের সঙ্গে সাধুর আনন্দের তফাৎ হচ্ছে—মাতাল যে আনন্দ করে সেটা হচ্ছে ভোগের আনন্দ আর সাধুর আনন্দ ত্যাগের আনন্দ।

ঠাকুর—আনন্দের degree নিয়ে কথা। মাতালের আনন্দ, Scientistএর আনন্দ এগুলির প্রত্যেকটীই ভূমার দিকে নিয়ে যায়—মাতালের আনন্দ হচ্ছে মদ খেয়ে brain centreটা খানিকক্ষণের জন্যে dormant হয়ে যাওয়ায় যে আনন্দ। এটা psychologyতে বলা আছে, তারা হয়তো আপাতিক দুঃখের হাত থেকে, চিন্তার হাত থেকে রক্ষার জন্য ওই মদটা খায়, আর সাময়িক ভাবে ওইগুলির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার চেষ্টা করে।

Scientistদের আনন্দও কতকটা সঙ্কীর্ণতাপূর্ণ। তারাও মাপ ও ওজনের জন্যে আকুল।

তারপর দেশপ্রেমিকের আনন্দ সেটা হচ্ছে ক্ষুদ্র আনন্দ; যখন পার্টীর President (প্রেসিডেন্ট) থাকে, electionএ হয়তো ভোট পেলে, lecture দিলে তখন খুব সম্মান, খুব বাহবা হাততালি পেল—কিন্তু যেই ভোট পেল না—Presidentএর পদ গেল তখনও lecture হয় তো দিলে কিন্তু তখন হয়তো কেউ বাহবা দিলে না, কাজেই তখন আর দেশপ্রেমের আনন্দ তার কাছে থাকবে না।

আর সাধুর আনন্দ নিজেকে তিলতিল করে আলিয়ে দেওয়া...সেখানে যা থাকে তা হচ্ছে ক্ষমা। এই বিশ্বজগৎ যাঁর চরণে বিধৃত, তাঁর আনন্দ পেলে তখনই সেই আনন্দ হয় ক্ষমার আনন্দ—আর মদ খাওয়ার যে আনন্দ, সে আনন্দ হচ্ছে নিম্নস্তরের আনন্দ। যারা মদ খায় তারা হয়ে যায় চিন্তাশক্তি বিহীন। self control হারিয়ে ফেলে, তারা তাদের rationality হারিয়ে ফেলে। এদিকে হয়তো ছেলে মরে গ্যাছে আর মাতাল হাসছে, বুদ্ধিটা গ্যাছে হারিয়ে, তাই বুঝতে পারছে না। একটা ছোট্ট প্রোটোজোয়া হয়তো একটু খাবার পেয়েই আনন্দিত। একটা গরিলা হয়তো তার বিরাট দেহের জন্য আনন্দিত আর আমরা মানুষ আমরা নিজের বুদ্ধির জন্য আনন্দিত।

বুদ্ধদেবের আনন্দ নির্বাণ লাভে। নির্বাক নলের কথা জানোতো, মস্তবড় বৌদ্ধ সাধক—নির্বাক নলের পিতা খুব বৃদ্ধ ভক্ত ছিলেন—তিনি মরবার সময় একমাত্র ছেলে নলকে বলেছিলেন বাবা একটী কথা তুমি মনে রাখবে 'যার কোন কিছুতে সুখবোধ নাই তার কোনকিছুতে দুঃখবোধও থাকে না।' তো এই একটী মাত্র কথা নিয়ে সাধনা করেই সেই ছেলে পরবর্ত্তী কালে মস্তবড় বৌদ্ধ সাধক হয়েছিলেন। এসম্বন্ধে সুন্দর একটী ঘটনাও ঘটেছিল।

ভগবান এই বিরাট বিশ্বকে সুন্দর মালার মত সাজিয়েছেন—অর্জুনকে বলেছেন 'মত্তঃ মণিগণ ইব'। অর্থাৎ সৃষ্টিকে তিনি মণিমালার মত গেঁথেছেন। এখন ওই মণির চাকচিক্য ছেড়ে অর্থাৎ জগৎ বোধ ছেড়ে যে ভগবানের দিকে যত এগোবে সে তত ভগবানের আনন্দ পাবে। মাতালের আনন্দ আত্মকেন্দ্রিক বা ব্যক্তিগত আনন্দ এবং ফল খুব ক্ষণস্থায়ী আর জগৎ আনন্দ ক্ষমার আনন্দ এবং ফল অনন্তকাল স্থায়ী।

সাধুসঙ্গে শ্রদ্ধা কেন হয় জানো? তাঁরা তো ঈশ্বরে অস্তিত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী, তাঁকে নিয়েই পড়ে আছেন। সাধুদের মন, প্রাণ, অন্তরাত্মা অবিরত তাঁরই চিন্তায় রত, কাজেই তাঁদের কাছে গেলেই—তাঁদের সঙ্গ করলেই সাধারণ লোকের ঈশ্বরে শ্রদ্ধা জন্মে। সাধুরা হ'চ্ছেন বিশ্বাসের পূর্ণ প্রতীক। তাঁদের তিনি ছাড়া তো আর কিছুই নেই। যেমন একটী বিরাট আগুনের কাছে গেলেই আপনি আগুন জ্বলে যায়।

—শ্রীশ্রীঠাকুর

দক্ষিণ তীর্থে

শ্রীবীণাপুরী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

২৩।৮।৬৭—ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনটী পণ্ডিচেরী ষ্টেশনে পৌঁছাল। আমরা মাদুরাই প্যাসেঞ্জারে এসেছিলাম, ওতে পণ্ডিচেরীর একটী বগি জোড়া থাকে। একটী ভদ্রলোকের কাছে পন্টু অনেক খবর সংগ্রহ কোরল রাত্রে ট্রেণে চলার পথে। ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্ম ছাড়িয়ে অনেকটা দূরে আমাদের বগিটী কেটে রেখে ট্রেণটী চলে গেল। আমরা ভাবছি এ আবার কি হোল ? লাইনের ধারে কি করে নামি ? কুলিই বা কই ? মিনিট দশ বারো পরে একটী ইঞ্জিন এসে লাগলো ও বগিটী টেনে প্লাট ফরমে নিয়ে গেল, আমরা জয় ঠাকুর বলে নামলাম। ষ্টেশনটী খুব বড় নয়, তবে রিক্সা ও কুলি ছিল। ঐ ভদ্রলোকের নির্দ্দেশ মত পন্টু রিকসা ওয়ালাদের প্রথমে অফিসে নিয়ে যেতে বললো, দুখানি রিকসায় আমরা রওনা হ'লাম। অফিসে পন্টু নেমে বোর্ডিং ও লজিং এর কার্ড করে, রিকসা দাঁড় করিয়ে কার্ড জমা দিয়ে সমুদ্রধারের ষ্টেট হাউসে আমাদের নিয়ে এল। ভারী সুন্দর জায়গা, গেটের পর রাস্তার ধারে সারি সারি ঘর একপাশে, অপরপাশে কর্ম্মীদের ঘর, খাবার জলের কল, বাগান, পরে সমুদ্র। বিরাট কম্পাউণ্ড, লাইট, ছেলেদের ঘর একটী করে, একটী করে মায়েদের। ঘরের মাপ অনুযায়ী সীট্। ছোট ছোট চৌকীগুলির নিচেটা বেশ ছড়ায় ও তাকের মত করা, জিনিষপত্র রাখার খুব সুবিধা। অনেকগুলি ঘরের পর শেষ প্রান্তে সারি দেওয়া বাথরুম। এ ছাড়া বাসন মাজা কাপড় ধোওয়ার জন্য কয়টাই আছে, সুন্দর ব্যবস্থা। গেটের কাছে ওদের চায়ের ষ্টল, যাত্রীরা ইচ্ছামত চা বিস্কুট খেতে পারে। অনেকেই তো অত দূরে যাবার ভয়ে ষ্টোভ প্রভৃতি নেয় না, আর কাঁকা সমুদ্রধারে দোকানও নেই, বোধ হয় সেই জন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাস্তাগুলিও খুব পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে পার্ক, বেশ সাজানো গোছানো পরিপাটী সহরটী। আমাদের ঘরটীতে আর একটী মহিলা ৪।৬টী কন্যা সহ ছিলেন, ওঁরা এইখানকার শিক্ষা, কলকাতা হ'তে এসেছেন। একমাস আছেন। মহিলাটী আমাদের সাদর অভ্যর্থনা করলেন ও মাত্র একটী দিন থাকবো শুনে দুঃখ করলেন। বিদেশে অল্প পরিচয়ের মধ্যে আত্মীয়ের মত ব্যবহার খুবই মিষ্টি লাগলো। আমাদের জিনিষপত্র রেখে স্নান করে আমরা দুখানি রিকসায় শ্রীঅরবিন্দের সমাধি মণ্ডপ দেখবার জন্য রওনা হলাম। গেটের পরই অফিস ঘর, ওখানে গিয়ে পন্টু ওদের সঙ্গে কথা বলে, দর্শনী দিলে, ওদের জানেই গাইড্ দিয়ে আমাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলি দেখিয়ে দেবেন এই ঠিক করে এলো। গেটের পর জন ধার দিয়ে সকলে স্নান করে ফুল হাতে যাচ্ছে দেখে আমরাও গেলাম সেখানে সমাধি বেদীটী ভক্তেরা সুন্দর করে ফুল ধূপ দিয়ে সাজিয়েছেন ও বেদীর চারি পাশে বসে ধ্যান করছেন দেখলাম। তার মধ্যে সাহেবও আছেন। আমরা কিছুক্ষণ দর্শন ও প্রণাম করে এসে জানে উঠলাম আরও একটী যাত্রী সপরিবারে আমাদের সাথী হোল। বিরাট ব্যাপার সেজন্য ঘুরে ঘুরে সবকটী নেমে দেখে ফিরতে আমাদের অনেক দেরী হবে বুঝলাম। গাইড্টী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্ম্মসূচী দেখিয়ে ও বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। ধান গম প্রভৃতি শস্য থেকে আরম্ভ

করে তরিতরকারি, মানুষের ব্যবহার্য যাবতীয় জিনিষ, গো-পালা, মুরগীর ডিম, সব কিছুরই ব্যবস্থা আশ্রমের। তেমনি কমল প্রভৃতির বাড়ীটীতে কত মহিলা কর্মী কাজ করছেন। এ ছাড়া খেলাধূলা, সাঁতার, থিয়েটার হল প্রভৃতি সবকিছুরই ব্যবস্থা। সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সাজানো, দেখবার ও দেখাবার মত।

ফিরে এসে আমাদের খাবারের বাড়ীটীতে যেতে হোল কারণ পল্টু কার্ড করে ছিল। সকালের পাউরুটী ফলের রস দেওয়া দুধ, ও কলা, চিনি, ওখানে আলমারীতে পল্টুর নামে জমা ছিল। অত অত যাত্রী তবু কোন ত্রুটী বিচ্যুতি নেই, সুন্দর ভাবে ঘরের মত ওদের পরিপাটী কাজ দেখে সত্যি খুব আনন্দ হোল। কর্মীরা নিখুঁতভাবে কাজ করে যাচ্ছে কোন রকম গোলমাল বা হৈ চৈ নেই। খাবার ঘন্টার সঙ্গে সঙ্গে সকলে কিউ করে থালা নিয়ে গেল, ভাতের জায়গায় ভাত ডালের কাছে ডাল ও তরকারির কাছে তরকারি নেওয়ার ব্যবস্থা। হলে আসন, জল, নুন ও ঘি দেওয়া থাকে। ফলও দেয় ভাতের সঙ্গে। পল্টু খেয়ে উঠলো। বাসন ওলি দেবার ব্যবস্থাও বেশ মজার, থালা র চৌবাচ্চায় থালা, বাটীর আলাদা, গেলাস আলাদা জায়গায়। পাতেরওলি গরুর জন্য—আলাদা পাত্র রাখা আছে। প্রচুর ফলা প্রভৃতি হয়। আশ্রমে মা লক্ষ্মী ও অন্নপূর্ণার কৃপা একেবারে ঝরে পড়ছে। যাঁরা ওখানে খাবার জন্য যেতে পারেন না, তাঁদের লোক এসে টিফিন কৌটায় খাবার ঘন্টার সময় মত এসে খাবার নিয়ে যায়। বেলা ১টার মধ্যেই হাজার হাজার লোকের খাবার ব্যাপার চুকে যাচ্ছে প্রতিদিন। পণ্ডিচেরীতে ফ্রেঞ্চদেরই বেশীর ভাগ, সুব্যবস্থাও রাশিয়ার মত। বাঙ্গালীও অনেক আছে। তারপর আমরা শ্রীঅরবিন্দের ওপরের ঘরটী দেখবার কথা বলায় একটী ভদ্রলোক আমাদের ওপরের সিঁড়ির কাছের বারান্দায় বসিয়ে বলে গেলেন ওপর হতে লোক এসে নিয়ে যাবে। আমরা বসে জপ করতে লাগলাম। প্রায় ১টার পর একজন সৌম্যমূর্ত্তি বৃদ্ধ, সাদা দাড়ি আবক্ষ, নেমে এসে ইসারায় ওপরে যেতে বললেন। ওঁর পিছু পিছু আমরা উঠলাম। সিঁড়িতে কার্পেট পাতা, পাশাপাশি দুখানি ঘর, ওধারে মাদার থাকেন। ঘরটীতে একটী সোঁকা বাষছালে ঢাকা, ফুল ও ধূপের গন্ধে মনটা নিথর করে দিচ্ছিল। ভদ্রলোকটী ইংরাজীতে ধীরে ধীরে শ্রীঅরবিন্দের দর্শন ও সমাধির কথা বললেন, পরের ঘরটীও সুন্দর সাজানো, ওখানে ভক্তদের দর্শন দিতেন। এ ঘরেও ঐ ভাবে ইংরাজীতে বলার পর আঙ্গুল দিয়ে সিঁড়ি দেখালেন, আমরা ধীরে ধীরে নেমে এলাম। তারপর আমরা বাসায় ফিরে একটু বিশ্রাম করে সমুদ্রধারের পাথরের বেঞ্চে গিয়ে বসলাম। পল্টু একটু বেড়াতে গেল, তার খুব পছন্দ পণ্ডিচেরী, বলে আপনারা খেলেন না, চাঁড়স, আলু কচু শাক প্রভৃতি সব তরকারি দিয়ে ঘাঁট বা সুন্দর, এরপর আমি এসে এখানে থাকবো—কোন ঝামেলা নেই কি সুন্দর জায়গা, আর কি পরিষ্কার কিছুতে হাত দেয় না, ইত্যাদি ইত্যাদি। সমুদ্রের ধারটাও বেশ সুন্দর তবে পুরীর মত বালির উপর দিয়ে যেতে হয় না। পণ্ডিচেরীর ধারটা সবটাই বাঁধানো, বাঁধানোর পর সরু রাস্তা, ও ধারে ধারে পাথরের বেঞ্চ। ওখানে বসে সমুদ্রের রূপ দেখতে খুবই সুন্দর লাগছিল। ভাবছিলাম, পুরীর সমুদ্র একরকম, মাদ্রাজের ভিন্ন, বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপ, পণ্ডিচেরীরও তাই। সমুদ্র বলতে একই সমুদ্র কিন্তু বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপের পরিবেশে নূতনত্বটীও দেখবার মত। সন্ধ্যা পর্যন্ত ওখানে কাটিয়ে আমরা রেষ্ট হাউসে ফিরে এলাম। আগের মহিলাটী পণ্ডিচেরীর খুব প্রশংসা করে বলেন, "এখানে খুব শান্তিতে আছি, শ্রীমা'র ব্যবস্থায় কারো কোন অসুবিধা নেই। কলকাতায় মেয়ে কটীকে নিয়ে ভয়ে ভয়ে দিন কাটে, এখানে রাত্রি ১টায় আমার মেয়েরাই খাবার নিয়ে আসে, কোন ভাবনা হয় না। ছেলে, মেয়ে যে যার কাজে যাওয়া আসা করছে কেউ কারো দিকে ফিরেও চায় না।" সত্যি এটা আমরাও দেখেছিলাম, সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা দেশের কথা ভেবে মনটা ব্যথিত হয়ে উঠেছিল। মহিলাটীর ছেলে নেই মেয়ে কটাই ওঁর ভরসা। সন্ধ্যায় আমাদের ঘরের সামনে একটী বাটিয়া এনে সকলে বসলাম, বাগান ও তারপরই সমুদ্র, সুন্দর হাওয়া দিচ্ছিল, মেয়েরা অনেক

কটী এসে জড়ো হলো অপর ঘরগুলি হতে, কেউ গান শোনালো। রাত্রি ৮টায় একটা ষেশন সাহেব ভিনিষপত্র সহ এসে আমাদের ঘরে আশ্রয় নিলেন। তাঁকে ঘরের একধারটা ছেড়ে আমরা জিনিষপত্র গুছিয়ে দুই বাঙ্গালী পরিবার একত্র হলাম ও চারটী চৌকী জুড়ে আমাদের শোবার ব্যবস্থা হোল। ষেশন বেচারী ছেলে মানুষ, ঐভাবে চৌকিতে শুয়ে প্রায় সারা রাত্রিটাই উঠছিল ও বসে থাকছিল দেখলাম।

卐

শ্রীমার সন্তানের কথা

মৃগেন্দ্র দত্তগুপ্ত

সেদিন বিকেলে আমার বিশেষ পরিচিত আই. টি. ও. শ্রীসিংহ মহাশয়ের চেম্বারে ব'সেছিলাম। উনি একজন ভক্ত মানুষ। তাই ওঁর সঙ্গে মাঝে মাঝে ধর্ম্মীয় আলোচনা হ'য়ে থাকে। সেদিন কথার মাঝে উনি ব'লছিলেন যে, শ্রীনরেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সংস্পর্শই নাকি তাঁকে এ'পথে এগিয়ে যাবার জন্য উৎসাহিত ক'রেছিল সর্ব্বপ্রথম। অফিসের কাজের মাধ্যমেই ওঁর আলাপ হয় নরেশবাবুর সঙ্গে। পরে আধ্যাত্মিক আলোচনা ক'রতে গিয়ে সিংহ সাহেব হঠাৎ আবিষ্কার করেন যে, তিনি একজন মহাপুরুষের সংস্পর্শে এসে পড়েছেন। এই সব কথা ব'লতে ব'লতে হঠাৎ উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন—"যাবেন কী ওঁর সঙ্গে দেখা ক'রতে!" আমি অত্যন্ত বিপন্ন বোধ করি! কারণ, আমার ত আর কোথাও যাবার প্রয়োজন নেই! সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরকে একমনে প্রার্থনা জানাই—'ঠাকুর আমাকে একটা কিছু ইংগিত দাও—আমি কী জবাব দিই ওঁকে।' ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সিংহ সাহেব ব'লে উঠলেন—"নরেশবাবু সারদা মায়ের দীক্ষিত সন্তান।" কথাটায় বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মতই চ'মকে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে একটা দুর্দ্দান্ত ইচ্ছা জাগলো তাঁর পুণ্য দর্শনের। ঠিক হয়—আজই যাওয়া যাক্ দেরী ক'রে কী লাভ! উনি ফোনে কথা বলেন নরেশ বাবুর সঙ্গে। নরেশবাবু বাড়ীতেই আছেন জেনে আশ্বস্ত হই। কিছুক্ষণের মধ্যেই রওনা হ'য়ে যাই ট্যাক্সী যোগে।

৭নং ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেণ্ড লেনে স্থিত তাঁর বাড়ীতে প্রবেশ করি সসম্ভ্রমে। তিনতলায় তাঁর বিরাট বৈঠকখানার চেয়ারে উপবিষ্ট ছিলেন নরেশবাবু। আমাদের ঘরে ঢুকতে দেখে উনি উঠে আসেন। চরণ-স্পর্শ ক'রে প্রণাম ক'রতেই আদর ক'রে বুকে জড়িয়ে আশীর্বাদ করেন আর আমার পরিচয় নেন। সামনে রাখা চেয়ারে উপবেশন ক'রেই প্রথমে ওঁর দিকে ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখি। দর্শনমাত্রই মনে হয়—৭৩ বৎসর বয়স্ক এই তেজোদীপ্ত মানুষটির মুখে যেন অসীম বিশ্বাস আর প্রগাঢ় শান্তির একটা গভীর ছাপ রয়েছে।

তারপর ঘরটিতে একটু চোখ বুলিয়ে নিলাম। অপূর্ব পরিবেশ ঘরটির! সারদা মা'র আর ঠাকুরের দুটি

বড় বড় ছবি ওঁর চেয়ারের সামনে দেওয়ালে টাঙানো, আর একটি গ্লাসকেসে সারদামা আর ঠাকুরের শ্বেতপাথরে তৈরী দুটি দিব্য মূর্তি। দেওয়ালের অপর পাশে টাঙানো র'য়েছে ব্রহ্মানন্দ মহারাজ, শিবানন্দ মহারাজ, প্রেমানন্দ মহারাজ আর বিবেকানন্দ স্বামীর চিকাগো Posture এর বেশ বড় বড় ছবি। আর র'য়েছে যীশুখ্রীষ্টের একটি চিত্র। যীশুকে উনি অত্যন্ত ভালবাসেন। বলেন— ঠাকুর যদি ওঁর জীবনে না আসতেন, হয়ত খ্রীষ্টিয়ানই হ'য়ে যেতেন উনি। আমি মা'র কথা কিছু শোনার জন্য আগ্রহ জানাই—বিশেষ ক'রে যেগুলো ওঁর জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে র'য়েছে। বলেন—"নিশ্চয়ই বলব, বলার জন্যই ত মা আমাকে রেখে দিয়েছেন!" উনি ব'লতে শুরু করেন—আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনি।

ওঁর বয়স তখন খুব কম। কলেজে পড়েন। দেশের বাড়ীতে যাচ্ছিলেন ট্রেণে ক'রে। কৃষ্ণনগর স্টেশনে ইংরাজ সরকার ওঁকে হঠাৎ বন্দী ক'রল—'স্বদেশী' ব'লে। নিয়ে গিয়ে ফেলে দিল আলিপুর জেলের একটা নির্জন কক্ষে (Solitary cell এ)। তিন দিন সেখানে কাটাতে হয় অশেষ যন্ত্রণায়। সমানে শ্রীঠাকুরকে গালাগাল দিতে থাকেন—মুখে যা আসে তাই ব'লে। বললেন—"ঠাকুর, তুমি মিথ্যা! যদি সত্যি হ'তে তা'হলে আমার মত একজন নির্দোষকে এভাবে এরা বন্দী ক'রে নির্জন কারায় ফেলে রাখল আর তুমি কিছুই ক'রতে পারলে না?" তিনদিন পর সেখান থেকে তাঁকে নিয়ে গেল প্রেসিডেন্সী জেলে। সেখানে থাকতে হোল আরও বাইশ দিন। তবে এই বাইশ দিন প্রমাণিত হোল ঠাকুরের অমূল্য দান ব'লে। প্রায় প্রত্যেক দিনই ঠাকুরের বেশ সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। একদিন স্বপ্নে দেখেন—উনি সমুদ্রের বিরাট বিরাট ঢেউএর মাঝে ডুবে যাচ্ছেন, হঠাৎ শ্রীঠাকুর এসে ওঁর হাত ধরেন আর বলেন—আমি থাকতে তোর ভয় কী?'—দেখতে দেখতে ঢেউ যেন কোথায় মিলিয়ে যায়! আর একদিন একা ব'সে আছেন কারাকক্ষে। দিনের বেলা—শুধু জানালা দিয়ে আসছে সামান্য একটু আলো। হঠাৎ স্তম্ভিত দৃষ্টিতে চেয়ে দেখেন ওঁর সামনে সশরীরে দাঁড়িয়ে র'য়েছেন শ্রীঠাকুর। আর অন্য পাশে বিবেক স্বামী দাঁড়িয়ে আছেন ওঁর চিকাগো Posture এ। শ্রীঠাকুর ওঁর দিকে তাকিয়ে থেকে একটু পায়চারী ক'রলেন কারাকক্ষে। নরেশবাবু আনন্দে পুলকে শিহরিত হ'য়ে উঠলেন এই অপরূপ দৃশ্যে। কয়েক মুহূর্ত পরই সব যেন মিলিয়ে গেল। ভক্তকে ধন্য ক'রে যাবার ধন ধরা দিলেন ফুলে। জন্ম জন্মান্তরের কত পুণ্য সঞ্চয়ের ফলে যে হয় ঠাকুরের এমন কৃপা,—তা একমাত্র ঠাকুরই জানেন।

জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্য ওঁর মন তখন যায়-যায়-নাই ব্যাকুল। শ্রীঠাকুরের কাছে চলে বিরামহীন প্রার্থনা। অবশেষে আসে আর এক কৃপাময় রাত্রি। স্বপ্নে আসেন শ্রীঠাকুর আর বলেন—"কাঁদছিস কেন? যা কাল তোকে ছেড়ে দেবে, আর রাজা তোর কাছে ক্ষমা চাইবে।" স্বপ্ন ভাঙতেই উনি আনন্দে লাফ দিয়ে পড়েন মাটিতে। মনে মনে ভাবেন—"ঠাকুর, এবার তোমার বাস্তবিক পরীক্ষা হ'বে। যা ব'লেছ যদি মিলে যায়, তাহলে আজীবন তোমার ক্রীতদাস হ'য়ে থাকব।' প্রতীক্ষার প্রতিটি মুহূর্ত কাটে অধৈর্য্য উন্মাদনায়। ভক্ত রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রস্তুত থাকে ভগবানের পরীক্ষা নিতে। কিন্তু সে কি জানে সে, যাঁর পরীক্ষা নিতে সে বসে আছে এত অধীর আগ্রহে, সে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রটি তাঁরই তৈরী? ভক্ত ভগবানের এ লীলা যুগে যুগে হ'য়ে এসেছে—শুধু হ'য়ে রয়েছে চির নূতন। অবশেষে প্রতীক্ষা লগ্নের হয় পরিসমাপ্তি। পড়ন্ত বেলায় ইংরাজ সরকারের একজন চর এসে দ্বার খুলে দেয় আর জানায় তাঁর বহু প্রত্যাশিত মুক্তি সংবাদ। তাঁকে নিয়ে যায় জেলারের কাছে। জেলার তাঁর মুক্তির আদেশ পত্রটি প'ড়ে শোনান। লেখা আছে—Mr. Naresh Chakravarty is released unconditionally and Government apologizes to him for wrongful detention (অর্থাৎ নরেশ চক্রবর্ত্তী বিনা সর্তে মুক্ত; সরকার তাঁকে বিনা দোষে বন্দী করার জন্য তাঁর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী)। শুনেই নরেশবাবু অজ্ঞান হ'য়ে লুটিয়ে পড়েন মাটিতে। জেলার ভাবেন, বোধহয় এতদিন জেলে কাটিয়ে ছেলেটা দুর্বল

হ'য়ে পড়েছে। জলের ঝাপটা দিয়ে হাওয়া ক'রে তাঁকে তোলা হোল। উনি বেরিয়ে এলেন মুক্ত হাওয়ায়, আর মনে মনে জানালেন অসংখ্য ধন্যবাদ সেই মুক্তির দিশারীকে যাঁর ইশারায় সম্ভব হোল এমন এক অভাবনীয় পট পরিবর্তন।

নরেশবাবু এবার বেলুড়ে যাতায়াত আরম্ভ ক'রলেন। প্রথম যেদিন যান সেদিন সঙ্গে ছিলেন দুজন বন্ধু। মন ছিল উদ্ধত। পরওয়া করছেন না কোনও কিছুকেই। বিশেষ ভক্তিও ছিল না মনে—সেদিন। বেলুড় গিয়েছিলেন শুধু যাওয়ার ইচ্ছা হ'য়েছিল ব'লেই—কোনও রকম দুর্বলতার বশবর্তী হ'য়ে নয়। কিন্তু সেখানে গিয়েই দৃশ্য গেল ব'দলে। প্রথম সাক্ষাতেই প্রেমানন্দ মহারাজ তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন স্নেহের আতিশয্যে—যেন কত যুগের চেনা—কত আপন! সেই ভাবেই জড়িয়ে ধরে তাঁকে নিয়ে গেলেন গঙ্গার ধারে। আর সেখানে পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই নরেশবাবু ভেঙ্গে পড়লেন যাঁর তাঁরা কান্নায়। হঠাৎ একী হোল! নরেশবাবু নিজেও বুঝতে পারেননি। মহান্ আত্মার পুণ্য স্পর্শ তাঁকে নিয়ে যায় এক অজানা আনন্দের লোকে—যেখানে গিয়ে সব হারিয়ে যায়—আর তাই অন্তর নির্বিবাদীও আকুল হ'য়ে ওঠে অনন্ত সমুদ্রে হারিয়ে যেতে। মনে হয় অহংএর বিরাট বাঁধ বুঝি হঠাৎ ধূলিসাৎ হ'য়ে গেছে, আর তাই অবাধ অন্তর প্লাবন ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সবকিছু। কিছুক্ষণ পর ওঁরা ফিরে আসেন মঠের ভেতর। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ব্রহ্মানন্দ মহারাজ নেমে আসেন সিঁড়ি বেয়ে। নরেশবাবুর মস্তক স্পর্শ ক'রে দেন স্নেহভরা আশীর্বাদ।

একদিন বেলুড়ের হরি মহারাজ ওঁকে মা'র কাছে দীক্ষা নিতে ব'ললেন। তেজস্বী মন হঠাৎ হ'য়ে ওঠে উদ্ধত। ব'লে উঠলেন—"সেকী মশায়! মেয়ে মানুষের কাছে আবার দীক্ষা নোব কী?" মহারাজ তাঁকে তিরস্কার ক'রলেন এবং ধ'রে নিয়ে গেলেন বীরানন্দ মহারাজের কাছে। বীরানন্দ মহারাজকে নরেশবাবু শ্রদ্ধাও ক'রতেন যেমন ভয়ও ক'রতেন তেমনই। মহারাজ ও মা'র সম্বন্ধে ওঁর ভক্তি শুনে খুবই ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠলেন এবং তীব্র ভর্ৎসনা ক'রলেন ওঁকে। পরে কাছে ডেকে ধীরে তাঁকে বোঝালেন মা'র মহিমা। হঠাৎ কী যে হোল—মনটা তাঁর গেল একেবারে পালটে। মাকে দেখার জন্য—মা'র কাছে যাবার জন্য শুধু ব্যস্ত নয়, পাগল হ'য়ে উঠলেন। তখন হরি মহারাজের হাত ধরে টানতে টানতে ছুটলেন রাস্তা দিয়ে উদ্বোধনের দিকে। রাস্তার লোকেরা বোধহয় একটু অবাক্ হয়েছিল—একজন যুবককে জনৈক সাধুর হাত ধ'রে রাস্তার মাঝে ওভাবে ছুটতে দেখে। উদ্বোধনে পৌঁছেই মহারাজ মা'র কাছে খবর পাঠালেন। মা একটু পরে দোতলার বারান্দায় বেরিয়ে এসে নরেশবাবুর দিকে তাকিয়েই ব'লে উঠলেন—"ও, নরেশ! ওত আমাদের ঘরের ছেলে!"

এরপর মা ও ছেলের ছোট-খাটো অভিমানের পালার কেটে যায় কয়েকটি ভুলো দিন। শেষে একদিন ছেলে জানায় দীক্ষার প্রার্থনা—মা যেন স্বীকৃতি। দীক্ষা হ'য়ে যায় কোনও এক পুণ্য মঙ্গলবারের সকালে। মা যেন সাক্ষাৎ জগজ্জননীরূপে প্রকাশিত হন সেদিন সন্তান সমক্ষে। আবেশে মা'র দেহদেহ দুলছিল এপাশ ওপাশ—এক স্বর্গীয় সুষমায় ভরাছিল শ্রীমুখ। দীক্ষার পর বিদায় নেওয়ার আগে উনি জিজ্ঞাসা করেন মাকে—"মা, দীক্ষা ত হোল, এবার থেকে কি আমিষ টামিষ খাওয়া বন্ধ ক'রতে হবে?" দৃঢ় অথচ সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে উত্তর আসে—"কে ব'লছে? আ-মি তোকে দীক্ষা দিয়েছি। এখন থেকে তোর সব ভার আ-মার। তোর যা খুশি হয় খাবি, যা খুশি হয় ক'রবি। অবশ্য মা নিষেধ দিন যেন এপাটী নিয়মিত চালিয়ে যান উনি। (ক্রমশঃ)

বিশ্বাস-বহ্নি

স্বামী বোধানন্দ

দিগন্তে ওই নেমে আসে মেঘ
পুঞ্জ পুঞ্জ সজল কাজল
ছেয়ে এল চারদিক,—
আবার ছিঁড়ে যে যায় মেঘ-জাল ;
ছেঁড়া-জোড়া জামা-গড়া
এই চলে শুধু।

নিত্য প্রভাত হ'তে সেই একটানা
জীবনের ছিন্নপত্রে রং তুলি বুলানো,
জীবনের পুঁথি আর অভিধান হ'তে
মিল আর মানে খুঁজে ফেরা—
বাঁচা আর মরা—দু'টো কথা।

বর্ষফল নিয়ে কত জল্পনা-কল্পনা—
ঐতো আছে লেখা বছরের পাঁজিতে—
এক নয়, দুই নয়—'বিশ আড়া জল'
নিঙড়োলে পাঁজিখানা—হয়ত ক'ফোঁটা যে পারে
কই ? পড়ে নাতো একটি ফোঁটাও ?

তারপর ছিন্নঝুলি হাতে নিয়ে
ঊর্ধ্বপানে শূন্য দৃষ্টি মেলে
অবশ আবেশে শুধু
সারাদিন পথে ঘুরে মরা।
তন্দ্রালু সন্ধ্যার আলো-আঁধারীতে
ক্লান্তদেহে ফিরে এসে ঘরে
সেই একই কথা—
মিলল না !

মিলল না দু'মুঠোও, ক্ষুধা ম'রে দিন গেল—
আঁধারের বুক চিরে ওঠে চীৎকার,
মূর্ত্তিমান ক্ষুধা ওই ধেয়ে আসে দুর্ব্বার,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে বলে—চাইনে
এই বেঁচে-ম'রে থাকা জীবনে।
শান্তি নেই বেঁচে থেকে—
ম'রে গিয়েই বাঁচি তবে ?

জীবন-মৃত্যুর আঁধার কারা হ'তে
এই কি পথ পালাবার ?
কে দেবে পরম আশ্বাস—
এই দিশাহারা ঘেঁটুলিয়া জীবনে ?
কে দেবে অভয় বিশ্বাস—
নিঃস্ব এ জীবনের অস্তাচলের ধারে ?

তিলে তিলে যন্ত্রণা অপমানে
এই ছন্নছাড়া সর্ব্বহারা বুকে
বিবেক জাগায়ে তোলো
হে বীরেন্দ্র !
জ্বেলে যাও—বিশ্বাস-বহ্নি।

শ্রীরামকৃষ্ণ মহাকাব্য

শ্রীঅর্চ্চনাপুরী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অস্ফুট চাঁপা কলির মত ছোট্ট বধূ সারদাটীরে
পাকস্তরীর আঁচল হ'তে ছিনায়ে ল'য়ে নয়ন নীরে
বক্ষে চাপি চন্দ্রামণি হাসিতে গিয়া কাঁদিয়া ভাসে
হারিয়ে যাওয়া পুরানো স্মৃতি ফিরিলো যেন আঁখির পাশে।
পলাশ মেঘে আবৃত কোনও নরম রাঙা উদয় রেখা
বাদল ঢাকা গগনে কভু আঁকে গো যদি গোলাপ লেখা
তেমনি স্নেহ আলিঙ্গনে মোহিত করি চন্দ্রাদিয়া
দাঁড়াল বধূ আঙিনতলে নূপুর দুটি মন্থরিয়া।
নিপুণা মঙ্গলিকা সবে দাঁড়ালো বর বধূরে ঘিরে
স্ত্রী আচারেরি ঘটায় এবে ব্রত করি সম্পাদিবে
সোহাগ ভরে কহিল কেহ বুলায়ে মধু বধূর পিঠে
নিখিল মাঝে হানো-গো ঐ নয়ন দুটি মিষ্টি মিঠে।
স্বর্ণজলে বধূর দুটি শ্রবণ দিঠি ধৌত ক'রে
এয়োতি কেহ কহিল "বধূ বাঁধো-গো তব মানস চোরে"।
"সোনাদী-রূপ কাজল দিয়ে ভাগর আঁখি দিলেম আঁকি
বাঁধিতে তুই পারিবি তারে বাঁধিতে যারে পড়েছি ফাঁকি।"
মঞ্জু দুটি চরণ ফেলি চলিলো বধূ আনত মুখে
শান্ত গতিরাগের সাথে, কতনা বিধি পড়িলো চোখে।
ফেনিয়ে ওঠা অমৃতসম উথলি পড়া দুগ্ধ ধারা
দেখালো কোন প্রাচীনা তারে—উজলি বধূ নয়নতারা—
দেখিল চাহি—কহিল সবে এমনি ক'রে লক্ষ্মীকাঁপি
উথলি তোলো সারদারাণী আঁচলে বাঁধি সোনার চাবি।
পূর্ণ অবয়বের মীন দেখালো কোন শুচিস্মিতা
লক্ষ তাহু প্রণতি মাখা চরণে চলে অনিন্দিতা।
তিমির কালো বরষা ঝরা কুন্তলেরি চূর্ণগুচ্ছি
সরায়ে ধনী নিবিড় দিঠে হেরিল ফুল আস্তগুচি।
এই কি তবে সুকুমারতা পদ্মালয়া রূপবতা
এই কি উমা মহেশবধূ শ্রীরাম প্রিয়া স্বর্ণ সীতা।
পক্ষণীর চিত্রপটে অস্ফুটে টানো রূপের রেখা
মাধুর্য্যেরই প্রতিমা মরি মূর্ত্তিত যেন জোছনা লেখা।
দোঁহার মুখে প্রসাদ দানি ভাবিল ধনী নয়নজলে
প্রথম কারে টানিয়া লবে শীর্ণ ভাঙা বুকের তলে।
পুণ্য বারি সিক্ত "দুধ আলতা শিলা" ধন্য করি
চেলাকলে ঝলক তুলি বালিকা বধূ দাঁড়ালো মরি।
বরণ পালা হ'ল যে সুরু, রুক্ষ ধূপামোদিত বাসে
ভরিলো গৃহ আঙিনতল গোলাপ ঘসা মদির শ্বাসে।
শঙ্খঘেত বদন করে পুণ্যক্রিয়া নিপুণা সতী
বরণডালা ঘুরায়ে বধূবরণ করে পুণ্যবতী।
তাম্বূলেরি পত্রগুলি পড়িল রাঙা আঁচল ঝাঁপি
অস্ফুটে ফোটা অঞ্জরীটি তাহারি ঘায়ে উঠিল কাঁপি।
পুরাঙ্গনা শঙ্খরোলে বাজিল জয়তূর্য্য নভে
নিদাঘ তাপ তাম্র বেলা কাঁপিল ধ্বনুধ্বনির রবে।
বিকচ কলহংস কেকা নূপুর দুটি গুঞ্জরিয়া
কমল লতা আলিঙ্গনে মৃণাল স্মৃতি সঞ্চারিয়া।
চলিল এবে সারদাবধূ মন্থী ঘুন্থী বরাঙ্গে পায়ে
বাসর সাথী দোসর সাথে দোলন চাঁপা বাসকছায়ে।
আঁখির নীল পেলব টানে ভ্রমর দিঠি আনত করি
চাহিতে গিয়া কাহার পানে কাঁপিল চুনী ওষ্ঠ মরি।
সজল রাঙা কপোল দুটী ঘর্ম্মজলে সিক্ত করি
অপটু হাতে ঘুমটে টানে—দখিনা কহে মরিগো মরি।
চাঁদনে যেন চাঁদের পানে এখন হতে কুমুদ কলি
নিটুর শশী জোছনা হ'য়ে ওয়াঙা পারে পড়িবে টলি।

রসিকা কেহ হাসিয়া কহে বলতো দেখি ও ননদিনী
রূপের গাঙে তলিয়ে যেতে পৈঠেখানি লবকি চিনি।
দর্পিতা সে মদনবধূ সে রূপময়ী রতিরে তব
বাঁধিতে সখী বলগো হিয়া হেরিয়া রূপ এ অভিনব।
দেখ্‌না সখী চলেছে দোঁহে গৌরী যেন হরের বামে
চন্দ্রাপীড় মিলনে হেরো শৈলজার বয়ান রাঙে।
জানিনা কবে কিশোর রাজা রূপের যাদুমন্ত্র সাধি
পঙ্খীর সোনায় শশী চেলীর ডোরে আনিল বাঁধি।
এ হেন কত পুলক কথা শ্রবণ করি নয়নে নত
উজিয়ে বরা বকুল মালা কলাপ বেণু ছড়ানো পথ।
রূপের বাস আবেশ ভরা বাসর গেহে চুকিল দোঁহে
উঠিল ধ্বনি হুলুধ্বনি পুণ্য শুচি মিলন মোহে।

কাটিয়া গেল সেদিনখানি নবীন বর বধূরে ল'য়ে
হাস্য কলরবের মাঝে নর্ম কথা কত না ক'য়ে।
প্রিয়ঙ্গুর পরাগ মাখা পাণ্ডু ছায়া নামিলো বনে
তন্দ্রালসা সন্ধ্যা লেখে তুর্জ্জলিপি অন্য মনে।
ঘুমালো একা পতত্রিণী নিভৃত নিদে কুলায় বুকে
জোছনা অনুলিপ্তা ধরা তাপসী মহাশ্বেতার রূপে।
শায়িতা লতা পল্লবেরি শয়নে একা বল্কলিতা
মুদিত শ্বেত কমলে গণে বিরহ নিশি সপত্নিতা।
হাসিল কাল নিশিথ চাঁদ গগনে নীল বাসরে একা
সুদূরাগত বাঁশরী তানে কুমুদ বঁধু দি'ল না দেখা।
বধূর মনে শবরী নিশি বাসিল একা বাসর বাতি
বিদায় ক্ষীণ সর্ব্বরীরে করিল আর যে'কনা সাথী।

(ক্রমশঃ)

ভাবনা-চয়ন

শ্রীপুরী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

জননীর সাথে কত না গল্পমাঝে
সে রাতি হল গো ক্ষীণ
কুলায়ে আবার জাগিল পাখীর সাড়া
গগনকে আবার নামিল দিন।

এতকাল তবু এমনি লজ্জাহীনা
এত সংযম তার
শোনে না তো কেহ কণ্ঠ বীণাটি কভু
দেখেনি তো তবু ঘন কুন্তল তার।

কর্ম্মে নিরত যতেক কর্ম্মচারী
শুধাইলে দুখ মনে
বলে গো শুনেছি আছেন হেথায় তিনি
দেখি নাই তাঁরে কখন বা কোন ক্ষণে।

আবদ্ধ ঘরে কর্ম্মে নিরত সদা
মনে তবু উল্লাস
নাই বা থাকুক চৈতী চাঁদিনী রাত
বারেকের তরে দেখিবার অবকাশ।

নাইবা থাকুক্ খেয়ালী সারঙে বাজা
বকুলের ঝিরিঝিরি—
মথিন সাগর;উতল করা গো ওই
গোপ বালকের শুনিতে বাঁশরী ধ্বনি।

তবে একদিন অন্তরযামী প্রভু
লাটুরে ডাকিয়া কন
যার যানে মন নিবিষ্ট তোর সদা
তিনি নহবতে কর্ম্মব্যস্ত রন।

সাথে লয়ে তারে দক্ষিতারে কন হাসি
শোন ওগো এই ছেলে
খেলে দেবে কটী দরদাও ঠেলে দেবে
পুত্রের সম আজ হতে এরে পেলে।

রয়াত শুনিতে আসে যোগীন্দ্র নাথ
সে যে বড় অনুগত
বৃদ্ধ গোপাল ঘাজার করিয়া আনে
আনে ভক্তেরা প্রণামী-দ্রব্য কত।

তারপর এল জয়া ও বিজয়া সম
গোলাপ যোগীন এরা
জগদ্ধাত্রীর যেন গো নর্ম্ম সখী
সাজায় যতনে দেবী করে সদা তারা।

সযতনে দেয় দীর্ঘ চীকুর বাঁধি,
নিত্য নতুন ছাঁদে
জড়ায় অঙ্গে কুঞ্জদারের আঁচল
নব আভরণ পরিতে কত না সাধে।

অলক্তরাগে রাঙায় চরণ চারু
তাম্বুল দেয় মুখে
গাগরি ভরণে এনে দেয় স্নানবারি
প্রসাদ বাটিয়া খায় গো সকল সুখে।

জয়রামবাটি গেলে কাঁদে মনোদুখে
শ্রীঠাকুর তাই দেখি
ফিরিলে বলেন ডাগর ডাগর চোখে
সেই যে মেয়েটি কাঁদে কত তোমা লাগি।

কর্ম্মে যতই ব্যস্ততা তাঁর থাক
মন থাকে তবু পড়ে
যেথায় বিরাজে পরাণ দেবতা প্রিয়
অন্তরতম বিরাজেন যেই ঘরে।

তাই তো ভক্ত ভগবান লীলা কথা
শ্রুতি মূলে আসি বাজে
থাকুন না তিনি যতই কর্ম্মে ডুবে
থাকুন যতই কল কোলাহল মাঝে।

সেদিন যখন নিখর ঘটের বুকে
এলায়ে আপন দেহ
ভাবিছে ভক্ত গভীর গহন মনে
ব্যথা মোর বোঝে এমন কি নাই কেহ?

চমকিয়া তারে অন্তরযামী ডেকে
কহিলেন মৃদুস্বরে
বাড়ী ফিরে যেতে গাড়ী ভাড়া নাই তোর?
আননা গো চেয়ে নহবত হতে ওরে।

লাজুক বালক আসিতে আসিতে ভাবে
কেমনে বলিব হায়
ভাড়ার কথাটি, কি আশ্চর্য্য হয়
পয়সা কয়টী নবতের দরজায়।

সেদিন অমনি নয়নে খাইতে বলি
কিবা লাগে তার ভালো
জানাইতে এসে দেখেন সারদা নিজে
মাখিছে মরদা চড়েছে ছোলার ডাল

হেরি বিস্মিত এই যোগাযোগ খানি
মুখে জাগে হাসি রেখা
নীলিমার বুকে ক্ষণে অপলকে চেয়ে
ফিরিলেন প্রভু আপনার গৃহে একা।

পুরুষ প্রকৃতি এক আত্মা মন দোঁহে
ভিন্ন লীলার লাগি
ধরে ভিন্ দেহ ভুঞ্জিতে সুখ দুখ
আপন স্বজন মাঝে আপন যাগি।

ভাবমুখে

শ্রীসুধীর গুপ্ত

(১)

ভাব-মুখে থাকো—ভাব-মুখে থাকো মন,
তবেই জীবনে পাবে তা'র দরশন।
সে যে প্রেমময়; অবারিত প্রেম-ধারে
সকলের কাছে ঢেলে দিতে আপনারে
তাহারই ভুবনে আকুল সে অনুখন।
ভাব-মুখে থাকো—ভাব-মুখে থাকো মন।

(২)

থাকিতে থাকিতে ভাব-মুখে, অবশেষে
মাতোয়ারা হ'য়ে সে প্রিয়ের প্রেমাবেশে,
মানব-জনম মোহন মধুর ভবে
তোমারও সহসা সফল হবেই হবে;
তা'রই লাগি' তা'রও এ গোপন আয়োজন,—
ভাব-মুখে থাকো—ভাব-মুখে থাকো মন।

(৩)

সাগরাভিমুখী তটিনী সাগরে পায়;
বায়ুমুখী সুর বাতাসেই মিশে যায়।
যে মুখে যাহার হিয়ার যাবার টান
সে মুখে সুখেরও নাই তা'র অবসান।
লভিতে সে প্রেম অনাবিল অতুলন
ভাব-মুখে থাকো—ভাব-মুখে থাকো মন।

——

ভারতের আধ্যাত্মিকতায় সৃষ্টি রহস্য

অরুণা মুখোপাধ্যায়

(ডিপ্লোমা-ইন-জার্নালিজম, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, অ্যাডভোকেট।)

[আগামী নববর্ষে প্রকাশিত ভারবুলেটে লেখা পাঠাবার জন্য আশ্রম থেকে চিঠি পেলাম কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাপ্রয়াণের পর থেকেই মন হয়েছে ভারাক্রান্ত। কি লিখি? হঠাৎ ঠাকুরের কৃপায় সৃষ্টি রহস্যের রূপ মনের পটে আঁকা হয়ে গেল। তাই আর ঠাকুর নাম দিয়ে লিখতে বসলাম।]

অনন্তকাল ধরে সৃষ্টির যে বিচিত্র বিকাশ ঘটেছে তার মূলে রয়েছে শক্তির অনন্ত খেলা।

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিবেদনা॥

এই থেকেই প্রমাণিত হয় প্রাণীগণ সৃষ্টির আগে অব্যক্ত ছিল, মৃত্যুর পরেও অব্যক্তই থাকে। তবে এই যে শক্তির অব্যক্ত রূপ তা বোঝা যাবে কি ভাবে? শক্তি অব্যক্ত কি-না latent (সুপ্ত) হলেই তা energy আর manifested (ব্যক্ত) হলেই তা force, শক্তির দুইটি রূপই হলো অব্যক্ত আর ব্যক্ত—জল উত্তাপ পেলে বাষ্প হয়; কিন্তু কেমন করে এই বাষ্প হলো। বিজ্ঞান তার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে এর উত্তর দেবে। উত্তাপে জল গরম আর হাল্কা হয়ে বাষ্পের রূপ নেয়; কিন্তু এ থেকেও এর একটি চরম আর পরম ব্যাখ্যা আছে যার ভিত্তি হলো পূর্ণ সত্তার উপর, এক অদৃশ্য শক্তির পূর্ণ স্বীকারোক্তি। বাষ্প হলো ঈশ্বরের শক্তির অব্যক্ত রূপ যা জলেই বিদ্যমান। ব্যক্ত হলেই বাষ্প।

সুতরাং শক্তি বা energy হলো অব্যক্ত—এর কোন আকার নেই। জগতের সর্বত্র এই শক্তি রয়েছে; কিন্তু এই শক্তি ব্যক্ত হলেই সৃষ্টির প্রকাশ সম্ভব। কেন না force বা ব্যক্তর আকার আছে। তাই force মানেই সৃষ্টি। সৃষ্টি কিনা বিকাশ বা বৈচিত্র্য। "কোন একটা জিনিষের নাশ মানেই সেটা ব্যক্ত ছিল, অব্যক্তে ফিরে গেল। 'নাশঃ কারণ লয়ঃ'—নাশ মানেই কারণে ফিরে যাওয়া—নষ্ট হওয়া নয়।" কোনটিই শূন্য অবস্থা হতে আসেনি। অস্তি বা যা আছে তা কখনো নাস্তি বা পরে 'না' হতে পারে না। গীতার ভাষায় "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।"

সব কিছুর মূলেই আছে কার্য আর কারণ। অব্যক্ত আত্মা হতে ব্যক্ত হলো শরীর। তবে কার্য আর কারণ মূলতঃ একই—পরস্পর পরস্পর হতে ভিন্ন নয়। কেবল আগে যেটি উদ্ভূত হয় সেটি হলো কারণ আর পরেরটি কার্য। সমুদ্রের তরঙ্গ একের পর এক উঠানামা করে—কিন্তু প্রত্যেকটি তরঙ্গই কি স্বাধীন! কারণ আর কার্যের প্রভাব কি এই তরঙ্গকে স্পর্শ করেনি। এর উত্তর ছোট্ট এক কথায় এই ভাবে বোঝানো যেতে পারে যে, সমুদ্রের প্রথম তরঙ্গটিই হলো কার্য আর তার আগে আরো একটি যে তরঙ্গ এসেছে সেটি হলো এই কার্যের কারণ। তবে এই কার্য আর কারণ Cause and sequence নির্দিষ্ট বা fixed নয়। বেদান্ত কার্য আর কারণকে অভেদ বলেছে; কিন্তু ন্যায় সাংখ্য পাতঞ্জল এরা কার্য ও কারণকে ভিন্ন বলে স্বীকার করেছে।

প্রকৃতপক্ষে কারণের (বীজের) আকারে অনন্ত শক্তিই আমাদের মধ্যে আছে অব্যক্ত রূপে। ঐ শক্তির প্রকাশ কার্যরূপে প্রতিফলিত হওয়াকেই বোঝায়। রেলওয়ে ইঞ্জিনের তীব্রগতিতে ছুটে চলাও এই অব্যক্ত শক্তির প্রকাশের ফল। বীজ বা অব্যক্ত আকারে কয়লার যে তাপ থাকে তা আগুনের সংযোগে ব্যক্ত হয়ে প্রকাশ পায়। আর তখনই বড় ইঞ্জিন ছুটে চলে অনন্ত শক্তি পরিচালিত হয়ে।

এখন প্রশ্ন হলো সৃষ্টি বা জগৎ কি ? এর উত্তরে বলা যায় শক্তিই হলো সৃষ্টি বা জগৎ। সৃষ্টির আগে জগৎ ছিল বীজের আকারে অব্যক্ত (latent)। মানুষের মনের অবচেতন স্তর (Subconscious mind) হলো এই অব্যক্ত প্রকৃতি আর এই প্রকৃতির ব্যক্ত অবস্থা হলো মনের চেতন অবস্থা (Conscious mind) জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার ঘুমিয়ে থাকে এই অবচেতন মনে আর প্রয়োজনমত পরিস্ফুট হয় চেতন মনে। বাকী সংস্কার থেকেই যায় অবচেতন মনে। তাই প্রকৃতি অনন্ত—তার শেষ নেই।

এখন কথা হলো এই অব্যক্ত প্রকৃতিকে কি ভাবে জাগানো যায়। এটিই হলো সাধনা। অব্যক্তের ব্যক্ত রূপ সাধনা দ্বারা প্রকাশ পায়। শিবের বুকে নৃত্যরতা মা কালীকে দেখে সৃষ্টির ভাব পরিস্ফুট হয়। শিব হল শব নির্জন আর কালী তার উপর নৃত্য করে সৃষ্টি করেছেন। একটি হল কারণ অপরটি হল কার্য।

সাংখ্যকার কপিল মনে করেন শক্তি প্রকৃতি ও সত্ত্ব-রজ-তমোগুণী। তবে সাংখ্যের পুরুষ কিন্তু এই প্রকৃতির সম্পূর্ণ বাইরে। পুরুষ হলেন চৈতন্যস্বরূপ—জড়বস্তু নন। কপিলের বর্ণিত পুরুষ আর বেদান্তের আত্মা অনেকটা একই। এঁরা জন্মমৃত্যুরহিত। সৃষ্টির বীজ থাকে প্রকৃতিতে। পুরুষের কিন্তু সৃষ্টি বা বিকৃতি কিছুই নেই, চেতন পুরুষের সহযোগে সৃষ্টির বীজ সম্পন্ন প্রকৃতি জাগ্রত হয়। জলের বিকৃত রূপ তরঙ্গের মত সাংখ্য মনে করেন প্রকৃতির বিকৃতি হলো সৃষ্টি। জলের গুণ হলো চাঞ্চল্য আর এই গুণযুক্ত হলেই জল হয় তরঙ্গ ; নির্গুণ হলে অবশ্য জল তার স্বাভাবিক অবস্থায়ই থাকে। বেদান্তে মায়া অর্থে এই গুণকেই বোঝানো হয়েছে। তবে সৃষ্টি, মায়া, ব্যক্ত, অব্যক্ত এসবই আমাদের কল্পনা প্রবণ মনের প্রতিচ্ছবি। বেদান্ত আর সাংখ্য এখানেই পৃথক।

প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টির ধারণা ও কল্পনা মিথ্যা। ব্রহ্মে মায়া কল্পিত ; তাই ব্রহ্মে সৃষ্টিও নিছক মিথ্যা ও কল্পিত।

সমস্ত সৃষ্টিই ঈশ্বরের ভাবা বা কবিতা। তাই কল্পিত মনের পরিস্ফুরণ ঘটালেন ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে। "He designed the world.....he projected his own divine image outside from within himself." অর্থাৎ ঈশ্বরের মানস প্রতিকৃতিই বাইরের জগতের আকারে রূপ নিয়েছে।

—(•)—

প্রফেসর হ্যাল্ডেন সম্বন্ধে

অধ্যাপক সমীর ভট্টাচার্য্য

নিবেদিতাকে যদি ভারতকন্যা বলি তাহলে হ্যাল্ডেনকে ভারত পুত্র বলা যেতে পারে। পুরো নাম জন বার্ডন স্যাণ্ডারসন্ হ্যাল্ডেন। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হ্যাল্ডেন কেন যে এই ভারতবর্ষকে এবং এই ভারতের মানুষকে এত ভালবেসেছিলেন সেকথা আজও স্পষ্ট নয়। বহুদিন আগে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় হ্যাল্ডেন প্রথম দেখেছিলেন ভারতের রূপ, ভারতের আলো, এবং সবচেয়ে অদ্ভুত ভারতের সাধারণ মানুষ। হ্যাল্ডেন মুগ্ধ হয়েছিলেন। তখনই মনে মনে ঠিক করলেন এ দেশে এসে বাস করতে হবে। শুধুমাত্র বাস করতে হবে নয়, স্বামী বিবেকানন্দ যেমন নিবেদিতাকে বলেছিলেন প্রতিটি দরিদ্র ভারতবাসীকে মনে করবে তোমার ভাই, তোমার বোন, এদের প্রত্যেকের সঙ্গে এমন ভাবে তোমায় মিশতে হবে যাতে এরা কোনদিন মনেও না জানতে পারে যে তুমি এদের থেকে পৃথক। তেমনি হ্যাল্ডেনও ঠিক করেছিলেন প্রত্যেকের সাথে সমান ভাবে, সমান হয়ে মিশে এদের আপন করে নিতে হবে। কিসের জন্য জানিনা, দরিদ্র, কষ্ট ক্লিষ্ট এই ভারতের মানুষ হ্যাল্ডেনের মনে সে সময় এক অদ্ভুত সমবেদনাময় অনুভূতির সৃষ্টি করেছিলো।

মাত্র ষোলমাস ছিলেন সেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়। অথচ এই অল্প সময়ের মধ্যে হ্যাল্ডেন ঠিক করে ফেলেছিলেন যে, এ ভারতবর্ষই তাঁর আপন দেশ, এদেশের লোকই তাঁর ভালোবাসার প্রতীক। সেইজন্য আবার ফিরে এলেন ১৯৫৭ সালে এই ভারতের মাটিতে এবং এদেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করলেন। এই এতদিনের তফাতে অনেক পরিবর্তন হয়েছে হ্যাল্ডেনের জীবনের। তিনি তখন প্রতিষ্ঠিত সম্মানিত বৈজ্ঞানিক। বিশ্বজুড়ে তাঁর নাম। হয়তো পরিবর্তন হয়েছে ভারতবর্ষেরও, ভারতের মানুষেরও। কিন্তু যে আকুল আগ্রহ নিয়ে হ্যাল্ডেন এতদিন অপেক্ষা করেছেন তার বিন্দুমাত্রও পরিবর্তন হয়নি, পরিবর্তন হয়নি হ্যাল্ডেনের ভারত চেতনার।

তাই ভারতীয় হ্যাল্ডেনের জীবনে দেখা গেলো, তিনি হাঁটছেন ভারতের ধূলিময় পথে, গ্রাম শহরের পথে ঘাটে। বৈজ্ঞানিক বন্ধু আহরণের জন্য হয়তো গেছেন কোন গ্রামের, কোন এঁদো পুকুরে। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী। পানাভর্ত্তি সে পুকুরে নেমেছেন, আর এদিকে চারিদিকে ভীড় হয়ে গেছে লোক। ভারতীয় ছাত্ররা থাকতেন সঙ্গে। সবাই তাঁদের জিজ্ঞেস করতেন কি করছেন সাহেব? আমরা কি কোন সাহায্য করতে পারি? হ্যাল্ডেন ভাষা বুঝতে পারতেন না কিন্তু যখনই কেউ কথা বলতো বোঝার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকতেন। তাঁর ছাত্ররা যখন তাঁকে বলতেন লোকেরা কি বলছে, পুকুর থেকে খুব উত্তেজিত ভাবে উঠে এসে সবাইকে ধন্যবাদ জানাতেন। ছাত্রদের কাছে বলতেন এমন জিনিষ ওদেশে কখনও দেখতে পাবে না।

ভারতীয় হবার পর থেকে হ্যাল্ডেন ভারতীয় পোষাক ছাড়া আর কিছু পরতেন না। ভারতীয়দের ইউরোপীয় পোষাকের সমালোচনা করে বলতেন ট্রপিক্যাল আবহাওয়াতে ও পোষাক মোটেই চলে না। নিজে পরতেন পাজামা ও পাঞ্জাবি। ধুতিও পরতেন মাঝে মাঝে তবে দক্ষিণ ভারতীয় কায়দায়। কিন্তু বলতেন বাঙালীদের ধুতি পরাটা খুব সুন্দর, তবে একটু কঠিন ধরণের, আমি ঠিক আয়ত্বে আনতে পারি না।

বড় অদ্ভুত মানুষ প্রফেসর হ্যাল্ডেন। সবাইকে সমান করে দেখার মহান মনোবৃত্তির এমন উদাহরণ খুব কমই মেলে। ভুবনেশ্বরে যখন ছিলেন Genetics and Biometry Laboratoryতে, একজন Junior

Scientific সহকর্মী যা মাইনে পেতেন তার থেকে বেশী নিজে গ্রহণ করতেন না। বেশী টাকাটা সবার মধ্যে ভাগ করে দিতেন। একবার গিয়েছেন কলকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেনএ ছাত্রদের ও সহকর্মীদের নিয়ে। হঠাৎ হ্যাল্ডেনের মনে হলো যে ওখানকার উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা তাঁর সঙ্গে যেমন ভালো ব্যবহার করছেন, ছাত্রদের সঙ্গে তার বিন্দুমাত্রও করছেন না। তীব্র চটে গেলেন হ্যাল্ডেন। তাই ওখানকার Officer-in-Charge যখন ওনার সঙ্গে করমর্দন করার জন্য হাত বাড়ালেন, হ্যাল্ডেন ছেলেমানুষের মতো হাত দুটোকে পেছন দিকে নিয়ে গেলেন। মৃত্যুর আগে হ্যাল্ডেনের শেষ ইচ্ছা তাঁর সম্পত্তি যেন তাঁর স্ত্রী ও সহকর্মীদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। যে সবচেয়ে বেশী দুঃস্থ সে যেন সবচেয়ে বড় অংশ পায়। বৈজ্ঞানিক গবেষণার মধ্যে ডুবে থাকতেন যে হ্যাল্ডেন, মানুষ হিসেবে তিনি যে কতো বিরাট ছিলেন তার এমন প্রমাণ আরও অনেক আছে।

কেউ কেউ বলতেন হ্যাল্ডেন ভীষণ বদরাগী ছিলেন। আবার অন্যরা বলতেন ঠিক তা নয় তবে কেমন যেন মাঝে মাঝে মাথা গরম করে ফেলতেন। হ্যাল্ডেনকে হয়তো কোন জায়গায় কিছু বলতে বলা হয়েছে, উনি বলছেন, যদি মাঝে কোন বাধা পেয়েছেন তাহলে আর রক্ষে নেই, সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়েছেন। এর পর হ্যাল্ডেনকে দিয়ে আর একটি কথাও বলানো সম্ভব হতোনা। সবচেয়ে মজা হতো যদি উনি কোন সভায় বক্তৃতা দিতে উঠতেন। সামনের মাইককে দূরে রেখে উনি প্রাণপণে চেঁচাতেন যাতে একেবারে শেষের লোকটিও ওনার কথা শুনতে পায়। এটা করতে গিয়ে মুখ লাল হয়ে যেতো, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতো, কিন্তু তবুও মাইকের সাহায্য নেবার কথা মোটেই ভাবতেন না। এই রকম সময়ে প্রেসের লোকেরা ছবি তুলতে গিয়ে বিপদে পড়তেন, কারণ হ্যাল্ডেন একবার এদিকে যাচ্ছেন তো আরেকবার ওদিকে, মাঝে মাঝে আবার উত্তেজিত হয়ে মুখও চাকছেন। বেশীর ভাগ সময়েই প্রেসের লোকেরা বিফল হতেন।

হ্যাল্ডেন কি ভগবান বিশ্বাস করতেন? উনি নিজেই বলেছেন যে আমি খৃষ্টান নই, একথাও বলেছেন যে ব্রহ্ম বা শিবে আমার বিশ্বাস নেই। মনে করতেন বিজ্ঞানই ওনার ভগবান। খুব রসিকতা করে বলেছেন যে জেসাস্ যদি আমাদের এই সময়ে জন্মাতেন তাহলে নিঃসন্দেহে তিনি সব কিছুকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে দেখতেন এবং বোধহয় ধর্মের দেবতা হিসেবে গণ্য হতেন না। কিন্তু তবু কি এ ব্যাপারে খুব স্পষ্ট করে হ্যাল্ডেনকে বোঝা যায়? তাঁর এক বিশেষ প্রিয় বন্ধুকে হ্যাল্ডেন প্রথম যে বইটি উপহার দেন সেটি একটি বাইবেল। তিনি যে ভারতীয় এটা বেশী করে প্রমাণ করার জন্য যখন তিনি ভারতীয় পোষাকে রোমে Feltenelli পুরস্কার গ্রহণ করলেন, তখন হ্যাল্ডেন গর্বিতভাবে সাংবাদিকদের বলেছেন "আপনারা ঠিক করে বলুন তো আমাকে একজন ভারতীয় সাধুর মতো দেখাচ্ছে না?" এই গর্বিত উক্তির পেছনে হ্যাল্ডেনের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিলো কিনা কে বলতে পারে!

হ্যাল্ডেন আজ নেই। কিন্তু তাঁর বিরাট কর্মময় জীবন তাঁর স্মৃতি বহন করছে। ভারতকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলেন। ভারতের মানুষের দরিদ্রতা, স্বাস্থ্যহীনতা এবং অশিক্ষা তাঁকে ব্যথিত করেছে। আমরাও তো ভারতেরই মানুষ। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে চোখের সামনে নিজের দেশকে, দেশের মানুষকে যে অবস্থায় দেখি তার প্রতিকারের কথা আমাদের মনেও আসেনা। আমরা মুখেই সব মানুষকে বাঁচার সমান অধিকার দেওয়ার কথা বলি, কাজে যে তার কতটুকু করি তার প্রমাণ দেওয়ার দরকার হয়না। মাত্র কয়েক বছর ছিলেন হ্যাল্ডেন। তাঁর পাশের মানুষকে যেমন দেখেছেন তেমনভাবে নিজেকে তৈরী করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। মাছ মাংস খাওয়া ছেড়ে দিলেন। অতি সাধারণভাবে জীবন যাপন করতেন। সিংহলে গেছেন, তখন ভারতীয় নাগরিক, তাঁকে থাকতে দেওয়া হয়েছে ইউরোপীয় কায়দায় বিরাট হোটেলে।

হ্যাল্ডেন সেখানে থাকতে অস্বীকার করলেন। পথে হাঁটতে শুরু করলেন। যেখানে ছোটখাটো পানের দোকানের মতো দেখতে পান সেখানেই অনুসন্ধান করেন কোনরকমে তারা একটা থাকার ব্যবস্থা করতে পারবেন কিনা, নিদেনপক্ষে একটা চৌকি আর মাথার ওপর সামান্য ছাউনি থাকলেই চলবে। হ্যাল্ডেনের এই ব্যবহারে অনেকে ভেবেছেন ওনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে তিনি সেই দেশের প্রতিনিধি যে দেশের শতকরা আশিভাগ লোকের মাথার ওপর একটু ছাউনি ও একখানি চৌকিই সম্বল। সমস্ত ভারতের যদি একটি প্রাণ থাকে আর সেই প্রাণ যদি এদেশের মা হন তাহলে এমন সন্তানকে নিশ্চয়ই সেই মা গভীর ভালোবাসায় ও আবেগে কোলে টেনে নিয়েছেন। হ্যাল্ডেনের ভারতচেতনার কোথাও না কোথাও এইরকম কোন অনুভূতি ছিলো যার জন্য ভারতে থাকাকালীন বহু বাধাবিপত্তি তাঁর এসেছে কিন্তু সেইজন্য শাস্তির কোন অভাব ঘটেনি তাঁর জীবনে। যদিও প্রাচুর্যের অভাব তিনি নিজের ইচ্ছাতেই গ্রহণ করেছিলেন।

এই একটি জায়গাতে নিবেদিতার সঙ্গে হ্যাল্ডেনের ভারতজীবনের বড় বেশী তফাৎ চোখে পড়ে। নিবেদিতা শ্রীশ্রীসারদামায়ের স্নেহভালবাসার জন্য হয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দ প্রতি মুহূর্তে লক্ষ্য রেখেছেন নিবেদিতার ওপর। কি ভাবে ভারতের প্রতিটি লোকের সঙ্গে মিশতে হবে, তাদের দুঃখ কষ্টের সাথে নিজেকে মিলিয়ে নিয়ে তাদের সেবা করতে হবে, এ শিক্ষা নিবেদিতা পেয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে। কিন্তু হ্যাল্ডেন একেবারে সঙ্গহীন। হাল্ডেনকে সাহায্য করতে বিবেকানন্দের মতো কোন উন্নত মানস চেতনার মানুষ এগিয়ে আসেননি। নিবেদিতা অনেক পেয়েছেন তাই ভারতবর্ষের মানুষের জন্য নিজেকে ঐরকমভাবে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে পেরেছেন। হ্যাল্ডেন ভারতের থেকে কিছুই পাননি তবু যত পেয়েছেন শুধু দিয়েই গেছেন। নিবেদিতার কথা, নিবেদিতার আদর্শ এবং নিবেদিতার সেবা গ্রহণ করে এদেশের মানুষ ধন্য হয়েছে। হ্যাল্ডেনের কথা কেউ শোনেনি। কুৎসিত রাজনীতি ও অশিক্ষিত লোকের নিন্দায় বিশ্বের খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক পাগল বলে পরিচিত হয়েছেন। কি দুঃখে এবং কি নিদারুণ বেদনায় হ্যাল্ডেন বাংলাদেশ ছেড়ে উড়িষ্যায় চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন সে ঘটনার কথা আজ কারুরই স্মরণে নেই।

ভারতের বৈজ্ঞানিকদের হ্যাল্ডেন যথেষ্ট সমালোচনা করেছেন। বলেছেন তারা কাজে বড় ঢিলে দেয় এবং নিজেদের কাজ সম্বন্ধে খুঁটিয়ে বিচার করে না। তবু এই হ্যাল্ডেনই প্রাণপণে পরিশ্রম করেছেন নিজের দেশ এই ভারতের সম্মান বিদেশের বৈজ্ঞানিকদের কাছে রক্ষার জন্য। বলেছেন ভারতবর্ষ দরিদ্রের দেশ, দামী যন্ত্রপাতি কেনার মতো টাকা তার নেই, তবে ভারতে যে প্রাচুর্য প্রকৃতি দিয়েছে, তাই তো বৈজ্ঞানিক গবেষণার পক্ষে যথেষ্ট।

ভারতপুত্র হ্যাল্ডেন বৈজ্ঞানিক জগতে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হয়ে জ্বলবেন আবহমান কালধরে। কিন্তু মানুষ হ্যাল্ডেনের কথা হয়তো অনেকেই ভুলে যাবে। হয়তো কারুরই মনে থাকবে না New Statesman এর সেই বিস্ময়কর উক্তির কথা যে—যদি কোথাও কোনদিন কাউকে বিন্দুমাত্র আঘাত করে কথা বলেছেন হ্যাল্ডেন, পাগলের মতো তার খোঁজে ঘুরেছেন, দেখা হলেই তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবেন বলে। আমরা হয়তো ভুলে যাবো সেই মহান লোকটিকে যিনি তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্যকে বিসর্জন দিয়ে শুধুমাত্র ভালোবেসে ভারতে এসেছিলেন। আমরা এমনই ভুলে গেছি হ্যাল্ডেনের সেই অপমানকে, হ্যাল্ডেন ভারতীয় রেজিষ্টারে Scientific Personnel হিসেবে তালিকাভুক্ত হলেন না যেহেতু তাঁর বিজ্ঞানে যথোপযুক্ত ডিগ্রী ছিলো না।

গীত সুধারস

প্রবীর মজুমদার

১৯৬৯ এর ফেব্রুয়ারীর শেষাশেষি—

মনের মধ্যে কি একটা অনুচ্চারিত অস্বস্তি অনুভব করছিলাম ক'দিন ধ'রে—ঠাকুরের গানকে আলাদা একটা অস্তিত্ব দিয়ে অনুভব ক'রতে হ'লে এই গীতরচনাগুলির একটি আলাদা সত্তা চাই। সব মহাকবির রচনারই আলাদা একটি পরিচয় আছে।—আমার ঠাকুরের গানের আলাদা পরিচয় থাকবে না? একটি বৎসর শেষ হ'তে লাগে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন—সাধনজীবনের পঁয়তাল্লিশটি বছরের একটি দিনও যাঁর সংগীত রচনা থেকে অব্যাহতি পায়নি—বিশেষ ক'রে শেষের উনিশ বছর, প্রতিদিন কমপক্ষে দু'টি ক'রে গান রচনা ক'রে মায়ের পায়ে যিনি সংগীতাঞ্জলি দিয়ে এসেছেন--সংখ্যা দিয়ে হিসেব করলে দেখতে পাই,—এখনও যাঁর স্থান সর্ব্বোচ্চে (এত অধিক সংখ্যায় দিব্য-সংগীত আর কোনও কবি বা গীতরচয়িতাও আজ পর্য্যন্ত রচনা করতে পারেন নি)—তাঁর গানের সত্তাকে সকলের কাছ থেকে আলাদা করতে না পারলে—এ গানকে অনুভব করা যাবে না। সুতরাং এ অস্বস্তির হাত থেকে মুক্তি চাই—

শ্রীঠাকুরের কানে তুলে দিলাম কথাটা একদিন সন্ধ্যায়।—বললেন, "আমি ভেবে দেখি।"—দু'দিন পরে নিজের মুখেই নিজের রচনার নামাংকন ক'রে দিলেন "গীতসুধারস"—

সেই থেকে ঠাকুরের প্রতিটি গানকে আমরা "গীতসুধারস" নামেই—প্রচলিত ও প্রচারিত ক'রে চলেছি। স্বপ্ন দেখেছি—কোন না কোনও দিন সারা ভারতবর্ষে এমন কি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এই দিব্য-সংগীত-সুধা।—সমস্ত পৃথিবীর লোক জানবে "গীত-সুধারস" বললেই কোন্ গানের রূপ ফুটে ওঠে। শ্রীঠাকুরের কৃপায় নিশ্চয় এ শুধু স্বপ্ন হয়েই নিশ্চল থাকবে না।—সত্য হবেই।—

"গীতসুধারসে"র যে গানটির স্বরলিপি এবারে দেওয়া হোলো—এটি শ্রীঠাকুর রচনা করেছিলেন—উনিশ শো উনসত্তর সালের পঁচিশে জুলাই তারিখে—অর্থাৎ তিরোধানের ঠিক ১২ দিন আগে। গানটিতে তাঁর আবেদন ছিল বালক গদাধরকে উদ্দেশ্য ক'রে। এই প্রসংগে প্রথম দু'টি লাইনকে নিয়ে অনেকের মনে একটু দুর্বোধ্যতা আসতে পারে—তাই সেই লাইন দু'টির একটু ব্যাখ্যা ক'রে দেওয়া প্রয়োজন মনে করছি। কামার পুকুরে বালক গদাধরের দুটি লীলাক্ষেত্র আজও অবিনশ্বর হয়ে আছে, একটির নাম মানিক রাজার বন—তদানীন্তন কালের স্থানীয় এক বিরাট

জমিদারকে সবাই ডাকতো "মানিক-রাজা" --তাঁরই এক বিরাট আমবাগানে বালক গদাধর সংগী সংগিনীদের নিয়ে "কৃষ্ণ-লীলা" খেলতেন। তারই কথা স্মরণ করে গানটি রচনা—

(তুমি) মানিক বনে খেলার ছলে
আবার আসবে কি ?

বালক গদাধরের আর একটি লীলাতীর্থ ছিল হালদার পুকুর। কামার পুকুরের এই বিশাল দীঘি থেকে সমস্ত পল্লীরমণীরা পানীয় জল আনতে যেতেন। বালক গদাধর তখন একটি পরিপূর্ণ রমণীর রূপ ধারণ ক'রে, পায়ে নূপুর বেঁধে বেণী দুলিয়ে কলহাস্যে মেতে তাঁদের সংগে সংগে যেতেন। কেউ কোনদিন ঘুণাক্ষরেও তাঁর এই ছদ্মরূপকে নকল ব'লে মনে করতে পারেন নি। সেই লীলাকে স্মরণ করেই আমাদের ঠাকুর লিখেছেন—

হালদার-তাল উতল করা
নূপুর রুণু রুণু বাজবে কি ?

শ্রীঠাকুর তাঁর রচনার মধ্যে মাঝে মাঝে দু'একটি হিন্দী বা দেহাতী কথা বাংলা ভাষার সংগে মিশিয়ে দিয়ে রচনাকে সুমিষ্ট ক'রে তুলতেন—এখানেও "তাল" শব্দটি তিনি হিন্দী "তালাও" শব্দটির কথিত উচ্চারণ "তাল" থেকে নিয়েছেন। "তালাও" শব্দের অর্থ বিশাল পুকুর বা দীঘি। তাই "হালদার-তাল" কথাটির অর্থ "হালদার-তালাও" বা "হালদার পুকুর।"

প্রবীণ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের এই লীলাকে স্মরণ করেই আমাদের ঠাকুর এই লাইনটি রচনা করেছেন। তিনি গানের আবেদনে, জানিয়েছেন তাঁকে,—তুমি এই পৃথিবীতে "আবার আসবে কি ?"—

শ্রীঠাকুরের শিশুভাবের অনুকৃতি দিয়ে রচিত এই গানটি সুর করেছিলাম আমি এই বছরের ৬ই জানুয়ারী তারিখে। সেদিন ছিল আমার জন্মদিন। তাই আমার জন্মদিনের অর্ঘ্য দিলাম শ্রীঠাকুরকে ; এই গানটির উপর সুরারোপ ক'রে আশ্রমের গংগার ধারের বারান্দায় ব'সে শ্রীঠাকুরের মূর্তির সামনে এই গানটি নিয়ে যখন বসেছিলাম, তখন শ্রীঠাকুর নিজেই কৃপা ক'রে এই গানের সুরটি এনে দিয়েছেন। কিন্তু সেইদিন সেই লগ্নে এ গানে আমি অনুভব করেছিলাম—"আমার ঠাকুরকে," তাই সুরে আমি তাঁকেই বারবার মিনতি করেছি--আবার আসবে কি ? এই মানিক বনে আর একবার কি আসবে ? কিন্তু একই গানের রচনার এবং সুরে দুটি রূপের আবির্ভাব হোলো কেন ?—এই কথা ভাবতে গিয়ে সেইদিন থেকে আমি সম্যক উপলব্ধি করেছি—শ্রীঠাকুর যাঁকে উদ্দেশ্য ক'রে এ গান রচনা করেছেন, এবং আমার সুর যাঁকে উদ্দেশ্য ক'রে এই রচনাতে সংযোজিত হয়েছে, এই দুটি আবির্ভাবের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই।—একই সত্তার দুই অবতরণ।—সেই একের বিভিন্ন রূপের বিভিন্ন লীলা।

আবার আসবে কি ?

রচনা—স্বামী সত্যানন্দ

সুর ও স্বরলিপি—প্রবীর মজুমদার

(তুমি) মাণিকবনে খেলার ছলে
আবার আস্‌বে কি ?
হাল্‌দার-তাল উতল-করা
নূপুর রুণু রুণু বাজবে কি ?
লুকোচুরি খেলার ছলে
রাধাশ্যামের লীলার সাথী
ধূলায় ধূসর তনু লয়ে
রাঙা পায়ে নবীন তৃণ দল্‌বে কি ?
মেঘের মাঝে বলাকারে
আবার এসে দেখবে কি ?
ধূলায় ধূসর সোনার তনু
আবার এসে লুটবে কি ?

ম — ম —	প — ধ —	— — — —	— — — —
মা ০ পি ক্	ব ০ নে ০	০ ০ ০ ০	০ ০ ০ ০
ম — ম —	প — ধ —	— — র্ণ ধ	প ম প —
মা ০ পি ক্	ব ০ নে ০	০ ০ খে লা	র ছ লে ০
প — প —	ধ ণ ণ —	ণ — — র্	ধ ণ প ধ
আ ০ বা র্	আ স্ বে ০	কি ০ ০ ০	তু ০ মি ০
ম — ম —	প — ধ —	— — — —	— — — —
মা ০ পি ক্	ব ০ নে ০		০ ০ ০ ০

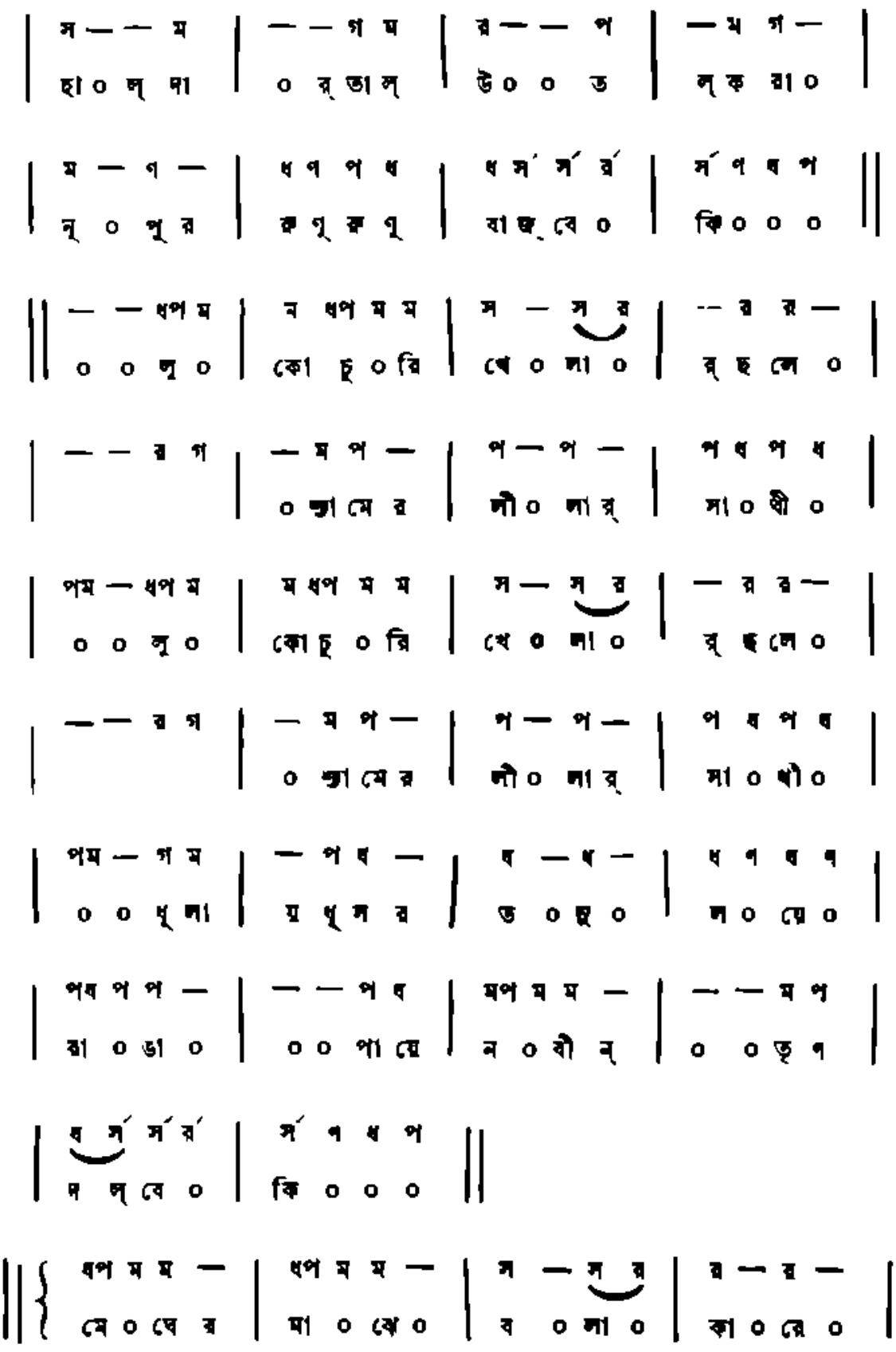
স — — ম | — — গ ম | র — — প | — ম গ —
হা ০ ল্ দা | ০ র্ তা ল্ | উ ০ ০ ত | ল্ ক রা ০
ম — গ — | ধ প প ধ | ধ র্সা র্সা র্রা | র্সা প ধ প
নূ ০ পু র | রু ণু রু ণু | বা জ্ বে ০ | কি ০ ০ ০
— — ধপ ম | ম ধপ ম ম | স — স র | — র র —
০ ০ লু ০ | কো চু ০ রি | খে ০ লা ০ | র্ ছ লে ০
— — র গ | — ম প — | প — প — | প ধ প ধ
| ০ ম্মা মে র | লী ০ লা র্ | সা ০ থী ০
পম — ধপ ম | ম ধপ ম ম | স — স র | — র র —
০ ০ লু ০ | কো চু ০ রি | খে ০ লা ০ | র্ ছ লে ০
— — র গ | — ম প — | প — প — | প ধ প ধ
| ০ ম্মা মে র | লী ০ লা র্ | সা ০ থী ০
পম — গ ম | — প ধ — | ধ — ধ — | ধ প ধ প
০ ০ ধূ লা | য় ধূ স র | ত ০ ছু ০ | ল ০ য়ে ০
পধ প প — | — — প ধ | মপ ম ম — | — — ম প
রা ০ ঙা ০ | ০ ০ পা য়ে | ন ০ বী ন্ | ০ ০ তৃ ণ
ধ র্সা র্সা র্রা | র্সা প ধ প
দ ল্ বে ০ | কি ০ ০ ০
{ধপ ম ম — | ধপ ম ম — | স — স র | র — র —
মে ০ ঘে র | মা ০ য়ে ০ | ব ০ লা ০ | কা ০ রে ০

— — র গ	— ম প —	প — প ধ	পধ পম — —
০ ০ আ বা	র এ সে ০	দে খ্ বে ০	কি ০ ০ ০

— — গ ম	— প ধ —	ধ — ধ —	ধ ণ ধ ণ
০ ০ ধূ লা	য় ধূ স র	সো ০ না র	ত ০ ছু ০

পধ প প —	— — ম প	ধ র্সং র্সং র্	র্সং ণ ধ প
আ ০ বা র্	০ ০ এ সে	লু ট্ বে ০	কি ০ ০ ০

বিজ্ঞপ্তি

শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেবের রচিত অজস্র গানে বহু সুরকার সুরারোপ করছেন। এই গান বহু কণ্ঠশিল্পী বিভিন্ন সঙ্গীতানুষ্ঠানে, বেতারে নিয়মিত প্রচার করে থাকেন। ঠাকুরের গান সম্বন্ধে এঁদের মতামত ধারাবাহিকভাবে 'ভাবমুখের' আগামী সংখ্যা থেকে জানাবেন অংশুমান রায়।

"ভাবমুখে সম্পাদক"

জয় ঠাকুর

বুলবুলি ভাইবোনেরা,

শুভ নববর্ষের সত্যানন্দ প্রীতি নিও।

উতলা চৈতী হাওয়া ঝরিয়ে দিল কালজীর্ণ পুরোনো পাতাগুলো। পুরাতন হারিয়ে গেল মহাকালের কোলে—স্মৃতি-বিস্মৃতির অতল তলে। নতুনকে গ্রহণ ও বরণ করার অপেক্ষায় থাকে বাসন্তী প্রকৃতি।

সৃষ্টির মূলে আছে প্রাণশক্তির খেলা। তার প্রকাশ মাঝে জাগে ব্যথার উত্তাপ। বৈশাখের আগুন ঝরা রোদের তাপে আর দুরন্ত কালবৈশাখীর আঘাতে যেন এই সৃজনী শক্তি বেদনারই যুগপৎ অভিব্যক্তি। সেই ভাবী সৃষ্টির প্রেরণায় প্রকৃতি প্রস্তুত হয় গ্রীষ্মের দাবদাহে জ্বলবার জন্য। সুতরাং চৈত্রের নগ্ন রুক্ষতায় যখন আসে প্রাণের সরসতা, প্রকৃতির বুকে জাগে নবারুণ আশা—সবুজ সতেজ কিশলয়-হাসির সম্ভাবনা। জাগে বৈশাখ। আসে নববর্ষের প্রথম প্রভাত।

আমাদের জীবন পথেও তেমনি পাওয়া না পাওয়ার সুখ দুঃখ মাখা একটা বছর হারিয়ে যায় মহাকালের বুকে। নববর্ষের প্রথম উষালগ্নে বৈশাখের প্রাণের পরশ তাই আমাদেরও অন্তরে জ্বেলে দেয় ভবিষ্যত আশার দীপ। আমরা নব প্রেরণায় এগিয়ে চলি। সে কারণে, নববর্ষের বৈশাখ আমাদের এত আদরের, আমরা তাকে স্বাগত জানাই অন্তর থেকে। এমনি চলে প্রতি বছর।

কিন্তু এবার কেন এমন হ'ল? বৈশাখ এমন বোবা হয়ে গেল কেন? সেই সঙ্গে তোমরা, আমরা, সকলে? সবই তো ছিল, সবই হ'ল—প্রতিবারের মত এবারেও ভোর হ'ল। পাখী ডাকল। প্রভাত-অধরে রবির রাঙা হাসির বিদ্যুৎলেখাও দেখা দিল মাঝে মধ্যে। মৃদুমন্দ পবন হিল্লোলও ছিল গাছের ডালে, পাতায় পাতায়, ফুলে ফুলে। সুরধুনীর বুকে ছিল ঊর্মিমালার

চঞ্চলতা। মণিমন্দিরের নীলাভ জ্যোতিতে ছিল মনোহারী স্নিগ্ধতা। প্রতিবারের মত এবারও মন্দির বারান্দায় পাতা হয়েছিল দেবতার পবিত্র আসনটি। পূজ্যপাদ স্বামী মহারাজ যথারীতি মন্দির প্রাঙ্গণে হোম করলেন। স্বামী অরুণানন্দজীর মধুর কণ্ঠে উপনিষদ, গীতা ও চণ্ডীর স্তবগানে আকাশ বাতাস সুরময় হয়ে উঠল। হোমের পবিত্র উজ্জ্বল শিখা ও সৌরভ, গানের সুর, আশ্রমের তরুলতা ও পশুপক্ষী—সব মিলে ঋষিযুগের এক ভাবগম্ভীর তপোবন পরিবেশ হয়েছিল সৃষ্টি। তবে কেন গুমরে গুমরে কাঁদল শুধু নববর্ষের প্রথম প্রভাত এমন করে। কৃষ্ণচূড়া গাছটা আর বুঝি সবুজ হবে না—"মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান"—শ্যামের সঙ্গে কি লীন হতে চায়? কেন? বরষের প্রথম অরুণ-কিরণ আজ এখনো কত ম্লান! আকাশখানা পাংশুবর্ণ—বুকে তার ব্যথার মেঘ-স্মৃতির উদাস আনাগোনা। জাহ্নবীর ঊর্মিচঞ্চলতা যেন অস্থির কান্না! হোমের সামনে বসে সমবেত ভক্তবৃন্দ জপধ্যানে মগ্ন হয়ে বুকের ব্যথা চাপার করে বৃথা চেষ্টা—মধুর অতীত স্মৃতিই কেবল ভেসে ওঠে মানস পটে—বিরহ ব্যথায় বুক হয়ে ওঠে ভারি—নয়ন বাষ্পাকুল।

যথাসময়ে হোমাহুতি হয়ে গেল। পূজ্যপাদ স্বামী নির্বেদানন্দজী (মাণিকদা) সকলকে দিলেন পবিত্র হোমাগ্নি তিলক। সকলে প্রণাম করল দেবতাকে তাঁর শূন্য আসনের সামনে। এমন সৃষ্টিছাড়া নববর্ষ এই প্রথম! প্রাণহীন এ বৈশাখকে স্বাগত জানাতে প্রাণ চায় কই? আরতির গানে বুলদার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। বিখ্যাত সুরকার ও কণ্ঠ শিল্পী প্রবীর মজুমদার দেবতার চরণে নববর্ষের প্রণাম নিবেদন করেন সুরের মাধ্যমে চোখের জলে। দেবতার আশিস্ ও নববর্ষের দেববাণী শুনতে হলো বুক ভাঙ্গা কান্না চেপে রুদ্ধশ্বাসে টেপরেকর্ডারে। জগৎ আর কি শুনবে না সেই অনুপম দিব্য কণ্ঠস্বর? আঁধার ধরা কি আর দেখতে পাবে না সেই অনিন্দ্যসুন্দর দিব্যরূপের আলো? স্তব্ধ আজ বরষের প্রথম প্রভাত! বৈশাখ শুধু আজ কাঁদে তার সকল প্রেরণার উৎসকে হারিয়ে।

বড় ময়ূর

"আমরা যেন ভাল হয়ে চলতে পারি, তোমার চরণে যেন ফুলের মত ফুটে থাকতে পারি, ঠিক ঠিক যেন তোমার ছেলেমেয়ে হতে পারি—আর আমাদের কল্যাণ কর, আমাদের গৃহের কল্যাণ কর—দেশের কল্যাণ কর—জগতের কল্যাণ কর। সকলের কল্যাণ প্রার্থনা করবে।"

—বেদমন্ত্র

ভাগ্যবান বৃক্ষ (১৬)

শ্রীসরযূ নাথ

তোমাদের কাছে অনেক ভাগ্যবান বৃক্ষের কথা বলা হয়েছে। এবার অপর একটি ভাগ্যবান অশ্বত্থ গাছের কাহিনী বলব। এ গাছটী এককালে অজানা অচেনা স্থানে বাংলার বাইরে ছিল বলা যায়। যদিও ঐ স্থানের অধিবাসীদের অনেকেই বাংলাভাষায় কথা বলে থাকে, ইংরেজ আমলে ওটা বিহারের মধ্যেই ছিল। বাংলা দেশটাকে খণ্ডিত করে পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব পাকিস্তান আর পশ্চিমবঙ্গ এ ভাবে দু-টুকরো করা হলে পরে পুরুলিয়ার বাংলাভাষী বড় অংশটাই পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যোগ করা হয়। আদ্রা আসানসোল রেললাইনের মাঝামাঝি মুরাদি ষ্টেশনের পূর্ব দিকের একটা গ্রামের নাম রামচন্দ্রপুর। সেই রামচন্দ্রপুরের একটী ভাগ্যবান অশ্বত্থ গাছের কথা বলছি।

পুরীধামের সিদ্ধবকুল গাছটা যেমন তার বাকল সম্বল করে বেঁচে আছে, আর তার সুশীতল ছায়ায় শ্রীমন্ মহাপ্রভু আর ভক্ত হরিদাসের মিলন হ'ত বলে প্রসিদ্ধি আছে—রামচন্দ্রপুরের অশ্বত্থ গাছটাও অনেকটা সেই বকুল গাছের মতো। মাটির ওপরের গুঁড়িটীর সারভাগ দৈবক্রমে নষ্ট হয়ে গেছে, তার চারিদিকের শক্ত বাকলের মতো অংশের ওপর ভর রেখে গাছটি বেঁচে বেড়ে উঠছিল। একসময়ে ঝড়ে গাছটি যায় যায় আরকি। একটু বেঁকে পড়েছে। তাই গাছটিকে রক্ষা করবার জন্য অনেকটা উঁচু করে বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর গাছের গুঁড়ির ফাঁপা অংশকে মাটি ভরতি করে যত্ন করা হচ্ছে যাতে করে গাছটী অনেককাল বাঁচতে পারে।

এই অশ্বত্থ গাছটীর বয়স ৭০০বছরের মতো। এর সঙ্গে অনেক স্মরণীয় কাহিনী জড়িত। এ অঞ্চল যখন মানভূম জেলার মধ্যে ছিল, তখন এ অঞ্চলে এক মহান কর্মযোগীর আবির্ভাব হয়। পাহাড়ী কাঁকুরে রাঙ্গা মাটীকে আর তার বাসিন্দা সাঁওতাল, বাঙ্গালী দীন দুখীদের সেবাকে শ্রেষ্ঠ কর্মরূপে বরণ করে নিয়ে স্বদেশ সেবার জন্য অনেক লাঞ্ছনা, অনেক অমানুষিক পীড়ন সহ্য করেছিলেন। এই কর্মযোগীর নাম ছিল শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ চক্রবর্তী। তিনি ভারতের বীর বিপ্লবী সুভাষ চন্দ্র বসুর আদর্শের কর্মী। রামচন্দ্রপুরের যে অংশে ঐ অশ্বত্থ গাছটী কালজয়ী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে বলা হ'ত মড়িভাঙ্গা। ঐ অশ্বত্থ গাছটীর তলে তান্ত্রিক সাধুরা পাশের শ্মশানের মড়া টাঙ্গিয়ে রাখতো। দিনের বেলায়ও কেউ সেখানে যেতে সাহস পেত না, অন্ধকার রাত তো দূরের কথা। অন্নদাপ্রসাদ গ্রামবাসীদের সেবা কর্মের সঙ্গে ওখানে সাধন ভজন তপস্যা করতেন।

রাজনৈতিক আদর্শে অন্নদা প্রসাদের গঠণমূলক কাজ সেবাব্রতে রূপান্তরিত হয়। এই সেবাব্রতের গোড়ার কথা; ইং১৯০৬সনে বিপ্লবীদের সঙ্গে অন্নদা প্রসাদের যোগাযোগ, তখনকার বাংলার

বাইরে মানভূমের এই বনাঞ্চলে বিপ্লব কর্মীদের গোপন আনাগোনা। যার জন্য ইংরেজ শাসকদের অমানুষিক অত্যাচারে তাঁর জীবন সংশয় হয়েছিল। সে অনেক কাহিনী।

ক্রমে অন্নদাপ্রসাদের জীবনের মোড় ঘুরে গেল। তিনি সঙ্গলাভ করলেন এক পরম সাধু কিরণ চাঁদ দরবেশজীর। দরবেশজী হলেন প্রভুপাদ শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে এই প্রভু বিজয়কৃষ্ণের অনেক উল্লেখ আছে। তিনি শান্তিপুরের শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর বংশের লোক। ক্রমে তিনি ব্রাহ্মভাবাপন্ন হয়ে পরে শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসে আবার উদার মতাবলম্বী হন। তাঁরই শিষ্য হলেন কিরণ চাঁদ দরবেশ। শুনা যায় তিনি ফকির দরবেশের মতো কাপড়ের টুকরার তালি দিয়ে তৈরী আলখাল্লা পরতেন বলে তাঁর গুরুদেব তাঁকে দরবেশজী বলতেন। সেই থেকে তিনি কিরণ চাঁদ দরবেশজী।

ঐ দরবেশজী দয়া করে অন্নদাপ্রসাদের রামচন্দ্রপুরের আশ্রমে এসেছিলেন। ঐ ভাগ্যবান অশ্বত্থ গাছের তলায় বসে গুরুশিষ্যের অনেক তত্ত্বকথা হয়েছিল। তারপর অন্নদাপ্রসাদ রূপান্তরীত হলেন স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী সন্ন্যাসী নামে।

ঐ অশ্বত্থ গাছতলায় তাঁর ভজন কুটীর, কুটীরের পাশে ছোট্ট মন্দিরে দরবেশজীর মর্মর মূর্তি। আর একটি বড় মন্দিরে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মন্দির।

অসীমানন্দজীর অসীম কর্ম্ম শক্তিতে গড়ে উঠেছে এখানকার এই বিজয়কৃষ্ণ আশ্রম। নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার জন্য এই আশ্রমে একটি চক্ষু চিকিৎসা কেন্দ্র গড়ে ওঠে। তার নাম দেওয়া হয় নেতাজী চক্ষু চিকিৎসালয়। বন্ধ পাড়াগাঁয়ে এ প্রকার সেবা প্রতিষ্ঠান দুর্লভ। এই হাঁসপাতালে হাজার হাজার গরীব মানুষ চোখের চিকিৎসার সুযোগ পায়। আর স্মরণ করে, অসীমানন্দজীকে, নেতাজীকে, সাধু কিরণ চাঁদকে আর পরম গুরু গোস্বামীপাদকে।

যে অশ্বত্থ গাছকে কেন্দ্র করে এই প্রতিষ্ঠান, এই আশ্রম, এই সেবাকেন্দ্র, বিদ্যালয়, ছাপাখানা এঁদের পরিচালিত মন্দির পত্রিকা, এ সকলের সবরকমের সমস্যা সমাধানের জন্য সকলে মিলিত হন এই ভাগ্যবান অশ্বত্থ গাছের তলার একটী কুটীরে।

❀

"কেউ কেউ জ্ঞানলাভের পর লোকশিক্ষার জন্য কর্ম করে, যেমন জনক ও নারদাদি। লোকশিক্ষার জন্য শক্তি থাকা চাই। ঋষিরা নিজের নিজের জ্ঞানের জন্য ব্যস্ত ছিলেন। নারদাদি আচার্য, লোকের হিতের জন্য বিচরণ করে বেড়াতেন। তাঁরা বীরপুরুষ।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত

আশ্রম সংবাদ

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-অভেদানন্দ প্রদর্শনী

গত ৩ঠা ফেব্রুয়ারী হইতে ২০শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত, রামপুরহাট গান্ধীপার্ক ময়দানের বিরাট মেলায়, রামপুরহাটের এস. ডি. ও. মিঃ মণ্ডলের উদ্যোগে ও শ্রীসমরেশ ঘোষের চেষ্টায়—রামপুরহাট শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের পক্ষ থেকে "শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-অভেদানন্দ" প্রদর্শনী প্রদর্শিত হয়। মাটির পুতুলের সাহায্যে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও তৈলচিত্রের সাহায্যে শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের আবির্ভাব হইতে মহাসমাধি পর্যন্ত বহু তথ্যপূর্ণ ঘটনাবলী, প্রতিদিন সহস্র সহস্র উৎসুক জনতার সম্মুখে প্রদর্শিত হয়। দেওয়ালে মাল্যদ্বারা সুশোভিত ছিল ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেবের প্রতিকৃতি। প্রজ্বলিত ধূপের গন্ধে ঘরখানি আমোদিত হইয়া মন্দিরের ন্যায় প্রতীয়মান হইত এবং বহুলোকের চিত্তে ভক্তি ও শ্রদ্ধার উদ্রেক হইত। স্বামী সচ্চিদানন্দ ও শ্রীসমরেশ ঘোষ অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে প্রতিদিন দূর দূরান্ত হইতে আগত অগণিত উৎসাহী জনতাকে উক্ত তথ্যপূর্ণ ঘটনাবলী সাবলীল ভাষায় বুঝাইয়া দিতেন। তারাপীঠের নিকটবর্তী স্থানের জনৈক ভদ্রলোক ঐ সকল প্রদর্শনী দর্শন করিয়া আনন্দে আপ্লুত হইয়া মন্তব্য করেন—"আজ আমরা তীর্থ ক'রে গেলাম।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিদ্যাপীঠ, রামপুরহাট

রামপুরহাট শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম পরিচালিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শিশু বিদ্যাপীঠের বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল—অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারেও সন্তোষজনক। উক্ত বিদ্যাপীঠের মোট ১৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১০ জন প্রথম বিভাগে ও ৪ জন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। আমরা উক্ত বিদ্যাপীঠের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, দোহালিয়া (কাশী)

গত ৫ই চৈত্র বৃহস্পতিবার (১৯শে মার্চ) হইতে ৭ই চৈত্র শনিবার (২১শে মার্চ) পর্যন্ত দোহালিয়া, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ ১৩৫তম জন্মোৎসব এবং ঠাকুর শ্রীশ্রীসত্যানন্দদেবের স্মৃতিপূজা এবং পুণ্য তাওারা উদ্‌যাপিত হয়।

৫ই চৈত্র বৃহস্পতিবার (১৯শে মার্চ) পূর্বাহ্নে শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেব এবং ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ পূজা, হোম, আরতি, চণ্ডীপাঠ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যাহ্নে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বৈকালে সুধী সম্মেলন ও সন্ধ্যা ৭টায় কলিকাতার লক্ষ্মীকান্ত রায় কর্তৃক শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেব ও ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাগীতি অনুষ্ঠিত হয়।

৬ই চৈত্র শুক্রবার (২০শে মার্চ) পূর্বাহ্নে নিত্যপূজা ও নাম সংকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যাহ্নে ভক্ত-নারায়ণ সেবা ও বৈকালে ৫টায় ভগবান শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের লীলাকীর্তন—দুর্গাদাস গোস্বামী কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়।

৭ই চৈত্র শনিবার (২১শে মার্চ) পূর্বাহ্নে নিত্যপূজা ও বৈকালে শিশুসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্য, পঞ্চতীর্থ।

সন্ধ্যায় শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্য, পঞ্চতীর্থ কর্তৃক শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও রাত্রি ৯টায় স্থানীয় ভারতী অপেরা পার্টি কর্তৃক যাত্রা গান 'একটি পয়সা' অভিনীত হয়।

ঐ উৎসবে প্রায় চারি সহস্রাধিক শিশু, ভক্ত ও দরিদ্রনারায়ণ সেবা অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, জাজিগ্রাম (বীরভূম)

গত ২১শে মার্চ্চ, ১৯৭০, শুক্রবার (১০ই চৈত্র ১৩৭৬) হইতে ২৮শে মার্চ্চ, শনিবার পর্য্যন্ত জাজিগ্রাম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের মনোরম এবং ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে "সন্তানেশ্বর-স্বয়ম্বোৎসব" অনুষ্ঠিত হয়।

এতদুপলক্ষে ২১শে মার্চ্চ, ১৯৭০, শুক্রবার সকাল ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের সুসজ্জিত প্রতিকৃতিসহ বাইক, বাজনা ও শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম সঙ্কীর্ত্তনরত কীর্ত্তনদল সহযোগে গ্রাম পরিক্রমা করা হয়। আশ্রমের সেবাদেবক শ্রীলালবিহারী সিংহ মহাশয়ের নেতৃত্বে বিদ্যাপীঠের ছাত্রছাত্রীগণ ও স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ঐ শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ করেন। পথের দুইধারে অগণিত উৎসুক জনতা ঐ শোভাযাত্রার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

পরে শ্রীশ্রীঠাকুর সন্তানেশ্বরদেবের বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, আরত্রিকাদি অনুষ্ঠিত হয় এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের পূত কথামৃত আশ্রম মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

মধ্যাহ্নে প্রায় আটশত শিশু, ভক্ত ও দরিদ্রনারায়ণকে ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করা হয়।

বৈকালে সন্তানেশ্বর-স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় স্বামী বিবিদিষানন্দ মহারাজ, স্বামী সচ্চিদানন্দ ও শ্রীলালবিহারী সিংহ—শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন বেদ আলোচনা করেন। পরে সভায় বিশিষ্ট কীর্ত্তনদল কর্ত্তৃক কীর্ত্তন গান অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ত্রিশ বিঘাব্যাপী মনোরম আশ্রম পরিবেশের একাংশে—পূর্ব্বে যেখানে 'সতীদাহ' অনুষ্ঠিত হোত—তথায় বিশেষভাবে নির্ম্মিত 'সতী-বেদী' নির্ম্মিত হয়। ২৮শে মার্চ্চ সকালে ঐ 'সতী-বেদী'-তে ত্রিনয়নী মা, ভগবান রামকৃষ্ণদেবের, শ্রীশ্রীমা, স্বামী অভেদানন্দ ও শ্রীশ্রীঠাকুর সন্তানেশ্বরদেবের বিশেষ পূজা, আরত্রিক, ভোগ, হোম, চণ্ডীপাঠ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। বৈকাল চারিটায়—শ্রীশ্রীসন্তানেশ্বরদেব বিষয়ে—শিশু আবৃত্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ শিশু সভায় শ্রীমৎ স্বামী বিবিদিষানন্দ মহারাজ, শ্রীলাল বিহারী সিংহ ও শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র সিংহ শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্যজীবনের আদর্শ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

সন্ধ্যায় স্থানীয় যাত্রাদল কর্ত্তৃক 'খেলাঘর নাটক অভিনীত হয়।

সমালোচনা

বস্তুবাদী সভ্যতার ভুল ভোগবাদের মধ্যে চারিদিকে মানুষের জীবন যখন বিপর্যস্ত, যন্ত্রণাকাতর, অশান্তি ও হাহাকারে ভরা, তখনই তো সবচেয়ে বেশী করে প্রয়োজন "অমৃত ধারা"র। তাতে সিক্ত হবে মানবমন, অভিষিক্ত হবে মানুষের জীবন।

'অমৃতধারা' গ্রন্থটির মধ্য দিয়ে সেই আহ্বানই যেন দিতে চেয়েছেন অমৃতময় পথেরই পথিক স্বামী নীলানন্দ। লেখকের হৃদয়ানুভূতির, মননশীলতার ফসল এটি। কেবল পাণ্ডিত্যের পরিচয়ই নেই, নির্বাচিত প্রবন্ধ ও কাহিনী-গুলি চিত্তাকর্ষক ও জীবনের উচ্চ আদর্শের নির্দেশক। ব্যক্তিগত অনুভূতির স্পর্শে অনেক প্রবন্ধই হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে।

লেখকের প্রথমপ্রচেষ্টা এই গ্রন্থটি। তাই তত্ত্ব ও তথ্যের পরিবেশনে ভাব ও ভাষার ঝংকারে হয়ত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠতে পারেনি, তবুও আজকের দিশাহারা মানুষকে মুক্তিপথের সন্ধান দেবে, শান্তির পথ দেখাবে এই গ্রন্থটি। তাই আমাদের বিশ্বাস এই যে, গ্রন্থটি সহৃদয় পাঠক মহলে যথাযথ সমাদর পাবে। গ্রন্থটির দ্বিতীয় পর্বের জন্য আমরা উন্মুখ হয়ে রইলাম।

—সুশান্তকুমার সরকার, এম. এ.

卐

"Ethical Epistemology of the Gita"

—World Philosophy

Swami Satyanandadev

According to the Gitā, Purusottama alone is the Knower, Knowledge and Knowable. His Parā Prakriti is the self or soul in us, and his Aparā Prakriti is the eight fold elements. He is Ksetrajna or the Knower of this human body, as also the Knower of this cosmic world, consisting of five elements, Ego, Intellect, the undifferentiated (Prakriti), ten sense organs, mind, the objects of the five sense organs and wish, aversion, pleasure, pain, the power of diverse mental functions, consciousness and endurance. Knowledge is ethically divided into (1) Svāttika jnāna or knowing multitudinous universe as manifestations of the one Reality, (2) Rājasika Jnāna or knowing the multiform, as various entities, (3) Tamasika Jnāna or knowing the phenomenal world as real, and to be attached to objects that are false, transitory and limited. When our nature becomes Svāttika, Jnāna is pure, lustrous, that is freed from all defects and is self-expressing. By Jnāna, we come to know the identity of the cosmic world and ourselves. Our empirical self, is nothing but an atom of Purusottama. The result of this knowledge is, that it destroys all grief, all sins, and all bondage. The highest knowledge is to know Purusottama as the transcendental, cosmic and immanent entity, to feel His identity with us, to see Him every where as working out the world system and to ees everything in Him, first knowing our identity with the cosmic world.

Rabindranath—The Great Educator

Susanta kumar Sarker M. A.

In Rabindranath we have found not only a great poet, a philosopher and a lover of nature but also a great educator who wanted to reconstruct man and his society. His educational ideas and ideals grew out of natural and profound thinking process of his life and they were in keeping with his own philosophy of life.

As a philosopher, Rabindranath was influenced by the 'Vedas' and 'Upanishads'. He realised unity in diversity. To him the whole universe was nothing but the manifestations of the 'Eternal Self' or 'Parama Brahma'. Indian Rishis conceived the concept of the 'Brahma' in a peaceful and sylvan surroundings of the forest. It is true that Indian civilisation embodied basic inspirations from the forest from which it learnt to develop its ideal of being able to live in with nature to realise oneness in life. It was perhaps the conviction of the importance of the environments upon the mind that led to the development of the traditional system of importing education in forest-schools called 'Tapabanas' under the fostering care and living contact of the worthy teachers. Rabindranath was very much fond of this 'Tapaban Education. So in one of his poems with an earnest and sincere zeal he says :—

"যে জীবন দিল তব তপোবনে,
যে জীবন ছিল তব রাজাসনে
মুক্ত-দীপ্ত সে মহাজীবন চিত্ত ভরিয়া লব
মুক্তা-তরুণ শঙ্কা হরণ দাও সে জীবন নব।"

He was familiar with the contemporary theories and practices of the West. But his deep love for Indian culture made him stick to the tradition of his own country regarding ideas, processes followed for the adequate communication of knowledge for the sake of real development of man. So he blended the western methods with Indian thoughts of education.

It was the idea of reconstructing life of man that impelled him to take educational thoughts and endeavours. Although a poet, he was not an idle dreamer in the field of education. His knowledge of "Science of Education," his uncommon love for children found expression even in his poems and his unflinching faith in the creative destiny of man conspired to make him an ideal practical teacher – 'Gurudev' for all.

Rabindranath considered an all-round development of man to be the aim of education. He wanted to achieve the enrichment and fulfilment of life through education. Education

for him was the education for the whole individual. "The aim of education should be to emancipate the educated from his mental slavery"—says he.

He considered the importance of freedom to be really great in life. He says, "The sign of good education is that it does not overwhelm man, it liberates him." He furthermore considered freedom to be the condition absolutely necessary for the establishment of neal discipline in life. His ideas of discipline seem, therefore, to be in keeping with modern concept of free discipline.

Rabindranath wanted to cause children to learn directly and also indirectly with the aid of various kind of activities. So he advocated the inclusion of manual instruction in the school curriculum. In connection with manual work he recommended the introduction of such subjects as drawing, nature study and school gardening etc. Self-development to the fullest extent, not only through individual means, but also through the processes of socialisation, is the highest aim of education according to our poet and educator Rabindranath. He accepted skill and activities as the means of individual development and also helpful to social progress. In all his educational thoughts and activities the broad features of Paido-centricism, which owes its birth to Rousseau, are well marked and he, as Gandhi had given a great fillip to modern educational thoughts in India. The main divisions of an educational curriculum, he enumerated (a) religion and religious instruction (b) natural science and mathematics (c) language (d) art and objects of art remarking that human education requires the knowledge and appreciation of religion, nature and language ; and with reference to the aim of instruction in art he states—its intention will not be to make each pupil an artist in some one or all of the arts, but to secure to each human being full and all sided development.

All his educational aims and ideas, Rabindranath successfully introduced in 'Santiniketan' at Bolpur in 1901. In his estay on Tapaban he declares that ideal Indian education and culture owe its origin in calm, lonely and natural setting of Tapaban. In 1905, he confidently introduced school 'Self—Government system' in Santiniketan. He was very been for vocational education. So he established Sriniketan in 1921 as an auxilliary institution to Santiniketan for rural reconstruction with the hope "To bring back life in its completeness to the villages making the rural folk self, sufficient and self-respectful, acquainted with the cultural traditions of their own country and competent to make an efficient use of modern resources for the improvement of their physical, intellectual and economic condition. Rabindranath's influence upon education has been quite great. His "**Viswabharati**" has tried to show the ways to richer and fuller life. The general principles underlying his philosophy is the revival of Indian ideal of education and preaching universal love. His name will be written in letters of gold in the history of the eminent educationists of the world.

Spiritual Talks

(From the Diary of R. L. Goel)

23. 4. 66

Lord :—Is there any question ?

None put any question.

Lord :—(Addressing to a devotee) Guru Nanak Saheb in the Granth Saheb has described various paths for realization of God, such as worship of God with form and also without form and also through work. Only perhaps the Sakti path, i. e. the worship of Goddess of Shakti (Kali) has not been described in it. Similarly, various paths have been described in the Vedas, in the Gita and Kathamrita. Now why so many paths are described ?

Swami Nirbedanandaji :—Thakur, all the paths lead us to the same identical results, i. e. realization of God. One and the same path cannot suit every constitution. To some of the people only Bhakti cult suits. To others Shakti cult may suit and other different paths to others.

Lord :—Yes, that is good. But according to the Vaishnavas, firm-faith (Nistha) in their cult is the main thing. If every path is correct and if we have knowledge about every path and accept it as true, then how to devlop Nistha ?

Sri Dewan :—Thakur, Guru will decide the path and he alone can fix up our faith also in that particular path.

Lord :—Shabash ! That is the correct answer. It is the Guru alone who understands your inner and inherent tendencies and choies the right path for you and then gradually your faith is built up under His guidance with His help.

Sri Charandas :—Thakurji, When Guru leads the Sadhak upto the last step of the ladder to Realisation, then what happens there-after ?

Lord :—What happens at the last stage when you realise God is still a great mystry. No one has been able to describe it. But one thing is sure that 'Ego' or the 'I' at that time is gone and you become one with Brahman. Guru gives you the last pull and Guru himself also merges into the Ishtam. Ishtam, Guru and Bhakta all become one at this stage. When enlightenment comes you know your inner nature as well as His nature.

卐

"Try to be in constant company with the Lord, be it by keeping Lord's Murti all around or by bearing His holy name imprinted on your person, or by wearing His Murti on your chest or forehead. Keep in touch with Him somehow or other. Let His divine sayings be your constant guide. In one word, try to keep Him with you, heart and soul."

—Vedachhanda

নূতন পুস্তক ! সদ্য প্রকাশিত নূতন পুস্তক !!

"অনুধ্যান" — শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দের অনুধ্যানে লিখিত ৫৩ সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনী ও গৃহী-শিষ্য ভক্তের দ্বারা লিখিত প্রাণের অভিব্যক্তি সমন্বিত পুস্তক মূল্য আট টাকা মাত্র

"গীতার বাণী" (১ম হইতে ৬ষ্ঠ অধ্যায়) সঙ্কলয়িত্রী শ্রীসাধনাপুরী শ্রীগুরুদেব শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দদেবের 'বেদছন্দা' মুখে কথিত, মূল, অন্বয়, অনুবাদ টীকা টিপ্পনী ভাষ্য বহুস্তোত্র সমন্বিত, এবং প্রাচীন ও আধুনিক, প্রাচ্য ব্যাখ্যাকারদের মতালোচনাসহ সঙ্কলিত মূল্য—দশ টাকা মাত্র

["গীতার বাণী" আষাঢ় ১৩৭৭ পর্যন্ত ২৫% বিঃ রে]

আমাদের ঠাকুরের আশ্রিত সন্তান, কর্তাবর্গ ও ভ ভক্তবর্গ সত্বর এই অমূল্য গ্রন্থদ্বয় সংগ্রহ করুন

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ২, শ্রীরামকৃষ্ণ সাহা
বরানগর, কলিকাতা-৩৬ ফোন :- ৫৩-২৫৭০

DRINK

ORPHAN'S TEA

For

Health & Economy

ORPHAN TEA SYNDICATE

133, Cornwallis St. Shyambazar

Phone 55-2704

যুগে যুগে যার আসা

স্বামী সত্যানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভাব জীবনের ও সাধনমার্গের এক অপূর্ব আলেখ্য এই গ্রন্থখানি এটা শুধুমাত্র জীবন কাহিনী নয়, জীবন বর্ণনাচ্ছলে জীবন আলোচনা এবং ভাষ্য

২য় সংস্করণ, পরিবর্ধিত মূল্য—পাঁচ টাকা।

"মানুষের মাঝে মানুষ রতন আছে"—শ্রীশ্রীঠাকুর ফোন ৩৪-৩১১১

PHOTO D. RATAN & CO. ডি. রতন এণ্ড কোং

22-1 CORNWALLIS ST. CALCUTTA কলিকাতা

In the Service of the Nation

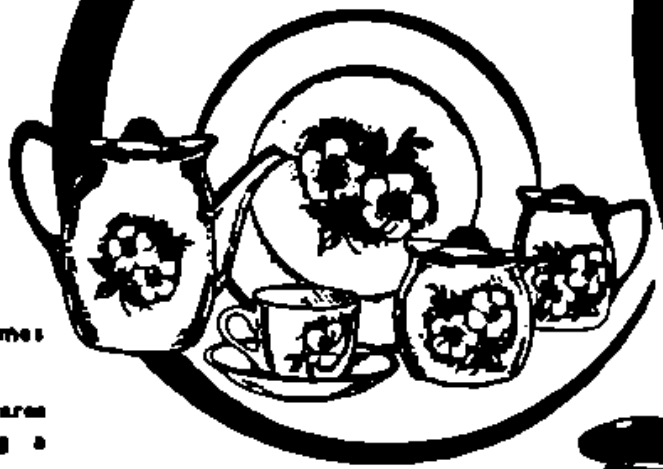

for Hotels & Homes

Best Fine Tea & Tableware Hand Painting a Speciality

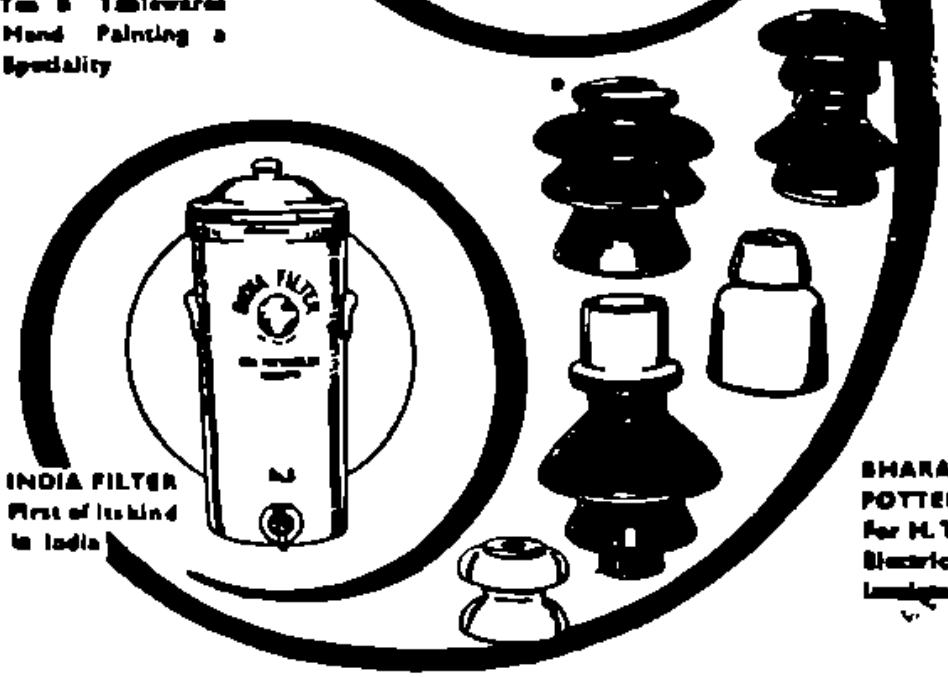

INDIA FILTER
First of its kind in India

BHARAT POTTERIES.
For H.T & L.T Electrical Insulators

Manufacturers & Exporters

INDIA POTTERIES LIMITED

91, DHARAMTALLA STREET, CALCUTTA-13

Sole Selling Agents—COMMERCIAL CONCERN, 17, Old Chinabazar Street, Calcutta-1.

৩০, রাজকৃষ্ণ মুখার্জী রোড, কলিকাতা—৪, হোক প্রেস হইতে মুদ্রিত ও ৩ প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন বরাহনগর, কলিকাতা—৩৬, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম হইতে প্রকাশিত। মুদ্রাকর ও প্রকাশক ও পত্রিকা সচিব—স্বামী উমানন্দ

যুগ্ম-সম্পাদক—স্বামী নীলানন্দ ও অধ্যাপক সমীর ভট্টাচার্য্য

সহ-সম্পাদক—ডঃ কীরেন চৈতন্য ও মৃগেন্দ্র গুপ্ত। প্রচার সচিব—স্বামী অমলানন্দ ও ডঃ তারক চৈতন্য

প্রতি সংখ্যা ৩০ পয়সা। বার্ষিক মূল্য—টাঃ ৩·০০